স্বামীজির জীবন কথা

কালিদাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-এ

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

কলকাতা প্রকাশনা নিকেতন

১২ ধর্মতলা স্ট্রীট

কলকাতা

১২ ধর্মতলা ষ্ট্রীটের কলকাতা প্রকাশনা নিকেতন-এর পক্ষ থেকে
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান
উদ্বোধন কার্যালয়
১ মুখার্জ্জি লেন
বাগবাজার

জানুয়ারী, ১৯৪০

মূল্য এক টাকা

কলকাতা ২০৯ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের গোবর্ধন প্রেস থেকে
রসিকলাল পান কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

মাত্র কিছুদিন আগে আমার লেখা "মানুষ রবীন্দ্রনাথ" বইখানা বাজারে বেরিয়েছে। চারিদিকে তার তীব্র নিন্দা,—দু একজনের মুখে গভীর প্রশংসাও শুনতে পাচ্ছি। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন পথে দেখা আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত বিভুপ্রসাদ বসু এম-এ, ও সরিষা রামকৃষ্ণমিশনের শ্রীমৎ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দের সঙ্গে। কথায় কথায় স্বামীজি "মানুষ রবীন্দ্রনাথ"-এর বিষয় উল্লেখ করে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দের একখানা জীবনী লিখুন না কেন। জবাব দিলুম, বই পাব কোথায়? তাঁর লেখা সব বই না পড়ে তো এ কাজে হাত দেওয়া যায় না। শেষে তাঁরাই নিয়ে এসে হাজির করলেন, অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী পবিত্রানন্দের কাছে। তিনি অনুগ্রহবশে পড়ার জন্য বই পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, আমার বইখানির গোড়াকার খসড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে উপদেশ দিয়ে একান্ত পরিচিত শুভার্থীর মত সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে সবিনয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ছেলে বয়সের পূজনীয় শিক্ষক ৺রজনীকান্ত সেনগুপ্তের সস্নেহ অনুপ্রেরণায় প্রথম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়তে শুরু করি, আজ তাঁর ঋণের কথাও মনে পড়ছে।

সাধারণত, জীবনী লিখতে গিয়ে আমরা ঘটনার ক্রমিক ইতিবৃত্ত রচনা করি। কিন্তু মনে হয়, প্রত্যেক জীবনীর মূলে থাকে এক একটি ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য—তার বিকাশের অকুণ্ঠ সাধনা আর তার পরিণতি—মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির এই বিকাশধারার কাহিনী অনুসন্ধান ও অনুবর্তন করাই জীবনীলেখকের যথার্থ কর্তব্য। আমি সেই আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। জীবনী মানুষের জীবনকাহিনী—ঘটনার মালা নয়। আর মানুষের সত্যিকার পরিচয় হচ্ছে তার অন্তঃপ্রকৃতি। বাইরের বিচিত্র ঘটনায় শুধু ছড়িয়ে থাকে সেই অন্তঃপ্রকৃতির নিবিড় প্রকাশ।

শেষে আর একটি কথা স্বীকার করা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাদির অনুবাদ নিজেই করে দিয়েছি। প্রচলিত অনুবাদের পাঠ উদ্ধৃত করি নি। স্বামীজির মতামত প্রকাশে যদি নিজের অক্ষমতায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত এবং স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ দেখার কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

আমাদের বাড়ীতে যিনি

প্রথম এনেছিলেন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার

প্রবাহ—

সেজদা

ডাঃ শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়,

এল-ডি-এস, আর-সি-এস, (ইংলণ্ড)-কে

স্বামীজির জীবন কথা



ভোরের আলো আঁধারি

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয় ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি, সোমবার। উনবিংশ শতাব্দীর এই ভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় কাল। তখন প্রথম ইংরেজি-লেখাপড়া জানা "ইয়ং বেঙ্গল"এর উচ্ছৃঙ্খলতা এবং তার সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধ-স্তুতির দিন কেটে গেছে। নদীর জল যখন কমে আসে, তখন তাতে জোয়ার জলের বান ডাকে। কিন্তু যে নদী একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি, সাগরজল তার মধ্যে ঢুকে আর সাগরজল থাকে না। তার নোনা যায় কেটে, নদীর জল তা মিশিয়ে নেয় নিজের মধ্যে। তখন মরা নদীর ভরা স্রোত আবার ছুটে চলে আশেপাশের জনপদকে উর্বর করে। প্রকৃতির জগতে যা সত্যি, জাতির উন্নতি অবনতির ইতিহাসেও তাই সত্যি বলে দেখা যায়। কোন প্রাচীন জাতির অধঃপতনের যুগে অপর জাতির সজীব সংস্কৃতি সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করে। প্রথম আকর্ষণের মোহে অন্ধ মানুষদল নিজেদের স্বকীয়তা

বিসর্জন দিয়ে "পরধর্ম" নিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু বেশিদিন এই মোহ থাকে না। অচিরে জাগে প্রতিক্রিয়া। ক্রমে অন্য সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রাচীন জাতির সংস্কৃতি আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন সে আপন অন্তরাত্মার খোঁজ পেয়ে পাঠিয়ে দেয় দিকে দিকে তার অভয় বাণী। ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থা, দর্শন এবং চিন্তাধারার সংঘর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা নিজের মূলকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছিল। প্রথমত, তার চেষ্টা দেখা যায় বাইরের দিকে। সিপাহী আন্দোলন ঘনিয়ে উঠেছিল জাতির রাজনৈতিক ব্যাকুলতাকে কেন্দ্র করে। সেই শক্তির উৎসকেন্দ্রে অবশ্য বাঙালী জাতির বিশেষ দান ছিল না। কিন্তু সেই চেষ্টার অবসানের পর দেখা যায়, ভারতবর্ষের এই নগণ্য পূর্বভূমিতে অপূর্ব চেতনা ক্রমশ মাথা তুলে উঠেছে। একদিকে মহর্ষি ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তোলেন ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন আর একদিকে বিদ্যাসাগর চেষ্টা করেন সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্যে। বিদেশী রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বিদেশী নাটক অভিনয় করে ভারতীয় শিল্পী তৃপ্তি পায় নি তাই এই সময়ে প্রথম চেষ্টা হয় ভারতীয় নাট্যগৃহ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা নাটক সৃষ্টি করার। সাহিত্যক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের আত্মা নিশ্চেষ্ট ছিল না। মধুসূদন ইংরেজি

রচনায় নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করার কাজে হতাশ হয়ে হঠাৎ ফিরে এলেন মাতৃভাষার মন্দিরে। ১৮৬১ খৃঃ প্রকাশিত হল তাঁর "মেঘনাদবধ কাব্য"। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই যুগ আত্ম-সন্ধানের যুগ,—আপনাকে ফিরে পাবার সাধনার যুগ। এই সন্ধিক্ষণে একই দশকের মধ্যে তিনজন বিরাট পুরুষ ভারতবর্ষের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী। * সেদিন আমাদের জাতির অন্তরে যে আকাঙ্খা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তা নিষ্ফল হয় নি। আজ সে তার অন্তরাত্মার সন্ধান পেয়েছে। পাশ্চাত্যের কাছ থেকে একদিন সে পেয়েছিল তীব্র আঘাত, এই তিন মহা-পুরুষের মধ্যে দিয়ে সেই পাশ্চাত্যকে আর একদিন সে শুনিয়েছে তার অন্তরের শাশ্বত বাণী। আশ্চর্য এই যে, সন্ধান-যুগের একই দশকে জন্ম-পাওয়া এই তিনজনের মত এত বিপুলভাবে আর কোন ভারতীয় পাশ্চাত্যের মনোহরণ করতে পারেন নি।

তিনজন পুরুষসিংহই জন্মগ্রহণ করেন এমন এমন বংশে যাকে নিতান্ত গোঁড়া, সনাতনপন্থী বলা যায় না। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউ-রোপীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। মহাকালের

* শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন।

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা অধঃপতিত সামাজিক আদর্শ এবং মূলহারা সংস্কৃতিকে অন্ধ অনুরাগের সঙ্গে আঁকড়ে থাকেন নি। তা বলে পরজাতির অনুকরণের উচ্ছৃঙ্খলতাও তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশে এবং পোরবন্দরের গান্ধীবংশে তো ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। সিমুলিয়ার দত্তবংশে তেমন একটা বিশিষ্ট সাধন পথের নিষ্ঠার সন্ধান না পাওয়া গেলেও কয়েক পুরুষের চরিত্রে সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য ও নিরাসক্তির পরিচয় খুব বেশি পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাচরণ প্রথম সন্তান জন্মাবার কিছুদিন পরেই সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। শাস্ত্রে আছে, সংসার ত্যাগের বার বছর পরে সন্ন্যাসীর মাতৃভূমি পুনদর্শন করা কর্তব্য। শোনা যায়, দুর্গাচরণ সেই উদ্দেশ্যে বার বছর পরে দেশে ফিরে এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। আত্মীয়েরা এই খবর পেয়ে জোর করে তাঁকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে আসেন। নিরুপায় দুর্গাচরণ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধা দিলেন না। বাড়ীতে এসে ঘরের কোনে চুপ করে ধ্যানে বসে রইলেন। একটি একটি করে তিন দিন তিন রাত কেটে গেল। কোন খাবার মুখে তুললেন না, কারো সঙ্গে বললেন না কোন কথা। শেষে আত্মীয়দের মনে ভয় হল, হয়ত বা তিনি অনশনে

মৃত্যুবরণ করবার সংকল্প করেছেন। তাই তাঁরা আর পাহারা না দিয়ে ঘরের দরজা খুলে রাখলেন। পরের-দিন সকালে দেখা গেল, ঘর শূন্য। সংসারত্যাগী বৈরাগী 'সুদূর'এর সন্ধানে আবার পথে বেরিয়ে গেছেন।

নরেন্দ্রের পিতা বিশ্বনাথের চরিত্রেও ছিল একটা নির্লিপ্ততা। তিনি ছিলেন কলকাতার উচ্চ আদালতের এটর্ণি। তাঁর এই পেশা পূর্বপুরুষের। তাই তাঁর মত মেধাবী, তখনকার কালে ইংরেজি ও ফার্সিতে সুদক্ষ আইনজীবী সহজেই অনেক টাকা রোজগার করতেন। কিন্তু টাকাকে তিনি কোনদিন জীবনে উঁচু আসন দিতে পারেন নি। মাসের রোজগার মাসেই খরচ করে ফেল-তেন। এমন কি আগামী দিনের ভাবনাও ভাবতেন না। তাঁর দান ছিল প্রচুর। কিন্তু দুর্গাচরণের নিরাসক্তির সঙ্গে তাঁর নির্লিপ্ততার তফাৎ ছিল। পিতার মত তিনি জীবনকে বৈরাগ্যের পথে অনুসরণ করেন নি। তাঁর ছিল বৈরাগীর প্রকৃতি নয়—শিল্পীর প্রকৃতি। তিনি গান ভাল জানতেন, কবিতা খুব ভাল বাসতেন। জীবনকে তিনি নিয়েছিলেন ভোগের আদর্শে। তিনি মুসলমান সমাজের আচার ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন।

নরেন্দ্রের মা ভুবনেশ্বরী দেবীর চরিত্র ছিল ব্যক্তিত্বে অপূর্ব। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সংসার পরিচালনার

সব ভার থাকে মেয়েদের ওপর। শিশু প্রতিপালনের দায়িত্বও স্বভাবতই তাঁদের ওপর পড়ে। সমাজের কাজে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াবার সমষ্টিগত অধিকার সেকালে এই হিন্দু রমণীদের ছিল না বটে কিন্তু ঘরের মধ্যে তাঁরা ছিলেন প্রধান। সেইদিক থেকে হিন্দুসমাজের শক্তির মূল উৎস তাঁরা। লোক চক্ষের আড়ালে এঁরা থাকতেন বলে এঁদের অন্তরের কার্যকুশলতা ও তেজস্বিতার পরিচয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু যাঁরা ভুবনেশ্বরীকে জানতেন তাঁরা লিখে গেছেন, তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না, কার্যকুশলা এবং তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁর স্মৃতি ও ধারণাশক্তি খুব প্রখর ছিল। ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন পুরোপুরি হিন্দু। হিন্দু মেয়েদের সংস্কার আছে, ইষ্ট-দেবতার কাছে মানত করলে মনোমত সন্তান পাওয়া যায়। গল্প আছে, ভুবনেশ্বরী পুত্র কামনায় কাশীর বিশ্বেশ্বরের কাছে মানত করেছিলেন। একদিন ভোরে বিশ্বেশ্বর তাঁকে স্বপ্ন দেন, তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁর গর্ভে সন্তান হয়ে আসছেন। তারপর যথাসময়ে শিশু নরেন্দ্রের জন্ম হয়।

ভবিষ্যতে তাঁর চরিত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল তার কিছু কিছু ছেলে বয়সেই তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত দেখা যায়। তাঁর প্রকৃতি মূলত ডিনামিক, নিয়ত ক্রিয়া-

শীল,—ভাবুকের মত নিশ্চল নয়। ছেলেবয়সেও তিনি কুনো ছিলেন না। লেখাপড়া, খেলাধুলা, ব্যায়াম বা তর্ক করে দশজন বন্ধুকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদে তাঁর দিন কাটত। তাঁর চরিত্র চিরদিন আবেগ-প্রবণ। জীবনে যখন যা করেছেন তাতে একেবারে তন্ময় হয়ে নিজের মন-প্রাণ সমর্পণ করে করেছেন। কখনো কখনো এই তন্ময়তা প্রায় একরোকা একগুঁয়েমির পর্যায়ে এসে দাঁড়াত। ছেলেবয়সে যখন তিনি খেলা করতেন তাতে এম্নি তাঁর একরোকা আগ্রহ দেখা যেত। সেই আগ্রহে তিনি নতুন নতুন খেলা উদ্ভাবন করতেন। আরো একটা চারিত্রিকতা সেই বয়সেই প্রস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তা হচ্ছে নেতৃত্বের দক্ষতা। কি শৈশবে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে সব সময়ে তাঁর একটা দল ছিল। পৃথিবীতে তিনি এসে-ছিলেন রাজার মহিমা নিয়ে। যেখানে যখন গেছেন লোকে তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। নত মাথায় তাঁর দুর্জয় পৌরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তিনিও সকলকে আশ্রয় দিতে পারতেন। তাঁর মত বিরাট পুরুষেরা বটগাছের মত। কত শত দুর্গত, ক্লিষ্ট, দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মানুষ তাঁদের ছায়ায় আশ্রয় পায়। বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া হলে বালক নরেন্দ্রকে মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিতে হত। তিনি শুধু নামে নেতা ছিলেন না। নেতার গুরুদায়িত্বও মাথায় তুলে নিতেন। বিপদের সময় নিজের

নিরাপত্তির জন্যে বন্ধুদের ছেড়ে পালাতেন না। নির্ভীক, অকুণ্ঠিত মনে এগিয়ে যেতেন। তখন তাঁর সাত আট বছর বয়স। একবার তাঁরা কয়েক জন বন্ধু মিলে মেটে-বুরুজের নবাবের পশুশালা দেখতে যান। ফেরবার পথে একজন বন্ধু ডিঙির ওপর বমি করে ফেলে। তাতে মুসলমান মাঝির মনে রাগ হয়। চাঁদপাল ঘাটে পৌঁছলে সে বললে, আগে বমি পরিস্কার কর তারপর নামতে দেব। নরেনরা বললেন, কোন মেথর ডেকে পরিস্কার করিয়ে নাও, আমরা পয়সা দেব। মাঝি তাতে রাজি হল না। জিদ্ ধরলে, ছেলেদের পরিস্কার করতে হবে। দুপক্ষের মধ্যে বচসা ক্রমেই চড়তে লাগল। ঘাটের অন্যান্য মাঝি এসে চারিদিকে ভিড় জমিয়ে তুললে। শেষে তারা ছেলেদের গায়ে হাত দিতে উদ্যত হল। নরেন তখন নিরুপায় হয়ে ভীড়ের মধ্যে পাশ কাটিয়ে ডাঙায় নেমে পড়লেন। বয়সে তিনি সকলের ছোট ছিলেন, তাই হয়ত মাঝিরা বাধা দেয়নি। তীরে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছেন, কি উপায়ে বন্ধুদের রক্ষা করা যায়, এমন সময় দেখতে পেলেন দুজন গোরা সৈনিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাড়াতাড়ি কাছে এসে তাঁদের হাত ধরলেন। ইংরেজি তখনো ভাল বলতে পারেন না। তবু যাহোক করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। শেষে সেই গোরাদের চোখ রাঙানিতে মাঝিরা ছেলেদের ছেড়ে দেয়।

১৮৮০ খৃঃ তিনি এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাতেই তিনি অসাধারণ কৃতি-ত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তবু ছাত্র হিসাবে স্কুল বা কলেজে কোথাও সাধারণ ছিলেন না। পাঠ্য বই বারবার পড়তে তাঁর ভাল লাগত না। বাইরের বই খুব পড়তেন। এনট্রেন্স পরীক্ষা দেবার আগে বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি সব বই পড়ে ফেলেছিলেন। ইতিহাস তাঁর খুব ভাল লাগত। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধেও সেই বয়সে অনেক বই পড়েছিলেন। তাঁর ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি। সেই শক্তি তিনি খুশিমত কাজে লাগাতে পারতেন। এই সময়ের একটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এনট্রেন্স পরীক্ষার কয়েকদিন আগে হঠাৎ তিনি দেখলেন, জ্যামিতি মোটেই পড়া হয় নি। অথচ না পড়লে পাশ করা অসম্ভব। তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, এখন কি করা যায়! হঠাৎ তিনি স্থির করলেন, যেমন করেই হোক জ্যামিতি শেষ করতে হবে। তারপর সারাদিন সারারাত জ্যামিতির বই হাতে নিয়ে কেটে গেল। পুরো চব্বিশঘণ্টা পরে চারভাগ জ্যামিতি পড়া শেষ করে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

নরেন্দ্রনাথ আই-এ ও বি-এ পড়েন এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজে। এই সময়ে তাঁর বিচিত্র ধর্মী ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি পাশ্চাত্যদর্শন,

তর্কশাস্ত্র ও যুক্তিবাদের ভক্ত ছিলেন। যে কোন আদর্শ-ধারা গ্রহণ করার আগে বিচার করে দেখব এই ছিল তাঁর ধারণা। কিন্তু তিনি গোঁড়া যুক্তিবাদী ছিলেন না। ধর্ম বলতে তিনি বুঝতেন না শুধু তর্কশঙ্কুল ভাবধারার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ। কারণ, তাহলে বাড়ী ছেড়ে দিদিমার বাড়ীতে নির্জন ঘরে একাকী চিন্তা, ধ্যান ও পড়াশোনায় দিন কাটাতেন না। জন্মের সঙ্গে তিনি পেয়েছিলেন হিন্দু সংস্কৃতি। তার ফলে জগত এবং জীবন সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট মিষ্টিক ধারণা গোড়া থেকেই তাঁর ছিল। সত্য আছে। আর ধ্যান ধারণার পথে জীবন দিয়ে সেই সত্যকে উপলব্ধি করা যায়—এই বিশ্বাস বরাবর তাঁর মনের গোপন কোনে ছিল। কিন্তু সাধারণ হিন্দু যুবকের মত সেই বিশ্বাসকে বিচার না করে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন নি। পাশ্চাত্যদর্শন পড়ার ফলে পদে পদে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে সব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইতেন।

বিবেকানন্দ চিরদিন জীবনের পাগল পূজারী। পৃথিবীর দিকে দিকে নিরন্তর চলেছে জীবননটরাজের অফুরন্ত লীলা খেলা,—মানুষ, গাছ, জীব তাঁর খেলার উপকরণ। বিবেকানন্দ বৈরাগ্যের প্রেরণায় এই বিপুল প্রাণধারার প্রকাশকে কোনদিন উপেক্ষা করেন নি। তাঁর বৈরাগ্য সাধনের পন্থা ছিল সংসার-বিবাগীর পন্থা

নয়। তাঁর জীবনে ছিল একদিকে গ্রহণ, আর একদিকে বিসর্জন। বর্জন তাঁর সাধনার আদর্শ ছিল না। বাঁধন দিয়েই বাঁধন ভাঙার খেলা খেলেছেন তিনি। যৌবনেও তাঁর মধ্যে দেখা যায়, একদিকে গভীরতর জীবনলাভের তীব্র ব্যাকুলতা আর একদিকে বাইরের জীবনকে ভোগ করার সহজ প্রেরণা। বন্ধুবান্ধব, গানবাজনা, আমোদ-কলহাস্যে তাঁর বাইরের জীবন ছিল মুখর। দূর থেকে তাই কেউ কেউ তাঁকে ভুল করতেন সাধারণ ধনীঘরের আদুরে দুলাল বলে। তাঁর ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাঁদের মনে দুশ্চিন্তা জাগত।

তখন কোলকাতায় শিক্ষিত সমাজের ওপর ব্রাহ্ম-সমাজের খুব প্রভাব। ভারতীয় মিষ্টিসিজমকে ব্রাহ্ম-নেতারা ইউরোপীয় যুক্তিবাদের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। সামাজিক কোন কোন আদর্শে তাঁরা অনু-সরণ করতে চেয়েছিলেন ইউরোপকে। তাঁরা ছিলেন মূর্তি-পূজার বিরোধী। অবতারবাদ এবং ব্যক্তিগত গুরুবাদ তাঁরা মানতেন না। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁরা জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছিলেন, মানুষে মানুষে সকলে সমান স্বীকার করতেন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্যে তাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্বভাবতই ব্রাহ্ম-সমাজে আকৃষ্ট হন। তিনি নিয়মিত সমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন। এমন কি ১৮৭৮ খৃঃ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে

মতবিরোধ হওয়ার ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাঁদের সভ্য তালিকায় নামও লিখিয়েছিলেন। তখনো তিনি জীবনের আদর্শ খুঁজে পান নি। সন্ন্যাসী-জীবনের কোন কল্পনা তখনো তাঁর মনে জাগে নি। মনে কেবল ব্যাকুলতা ছিল গভীরতর জীবনের জন্যে। তিনি জানতেন, তিনি সাধারণ নন। বিরাট শক্তি নিয়ে তিনি জন্মেছেন। পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ হয়ে সামান্য জীবনের গতানুগতিক দিনগুলো কাটিয়ে গেলে তাঁর চলবে না। ছেলে বয়স থেকেই তাঁর মনের কোনে এই বোধ জেগে উঠেছিল। কখনো কখনো তাঁর অন্তরে অবশ্য দ্বন্দ্ব উঠত, কি হবেন তিনি? বুদ্ধ বা শঙ্করের মত সত্যকে জেনে দেশেদেশে মানুষকে নতুন বাণী শোনাবেন, না, বড় আইনজীবি হয়ে কোলকাতার ধনীসমাজে একজন বিখ্যাত লোক হবেন? কোন্ জীবনের জন্যে তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে—আধ্যাত্মিক না লৌকিক? কি হবে তাঁর চরম আদর্শ, ত্যাগ না ভোগ? এ কথা স্বীকার করতে হবে, আধ্যাত্মিক জীবন মানে যে একনিষ্ঠ সাধক-জীবন, সে ধারণা তখনো তাঁর হয়নি। সন্ন্যাসীজীবনের দিকে গভীর কোন আশঙ্কা থাকলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের কাছে না গিয়ে সাধুসন্ন্যাসীর কাছে সন্ধান করতেন। ভারতবর্ষে কোন সময়েই আধ্যাত্মিক সম্পদে মহান পুরুষের অভাব হয় নি। বরং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

সঙ্গে দেখা হবার প্রথম দিকে সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি ইংরেজি শিক্ষিতের গভীর সন্দেহ তাঁর মধ্যেও দেখা যায়। প্রথম সাক্ষাতের ফলে তিনি পরমহংসদেবকে পাগল সাধু মনে করেছিলেন। তখনো আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল সে যুগের ব্রাহ্মভাবাপন্ন, সত্যানুসন্ধানী ইংরেজি শিক্ষিতের মত। আগেই বলেছি, "ইয়ং বেঙ্গল" ভারতীয় সব কিছুকে যে অবজ্ঞার সঙ্গে একদিন বর্জন করেছিল, এ যুগে ইংরেজি শিক্ষিতের মনে সে অবজ্ঞা ছিল না। মহর্ষি প্রভৃতি ইংরেজি লেখাপড়াজানা সাধকদের দৃষ্টান্তে কারো কারো মনে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জেগেছিল। তাঁরা ইউরোপীয় যুক্তিবাদীর দৃষ্টি দিয়ে তা জানতে চেয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের অন্তরেও কম-বেশি সেই ধারণা ছিল। যাই হোক, কিছুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বুদ্ধিবাদী নেতারা তাঁর হৃদয় অধিকার করে রেখেছিলেন। কিন্তু পরে ক্রমশ তাঁর মনে দ্বন্দ্ব আরো ঘনিয়ে ওঠে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয় তীব্রতর। তাঁদের মতবাদ নিয়ে তাঁর তরুণ তৃষ্ণার্ত মন তৃপ্তি পায় না। শেষে একদিন নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে এসে হাজির হলেন মহর্ষির কাছে।

দেবেন্দ্রনাথ তখন থাকতেন গঙ্গার বুকে নৌকায়। সংসার থেকে দূরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ধ্যান করে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ একজন যুবককে দেখে তিনি অবাক

হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বার হবার আগেই দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ নরেন্দ্রনাথ প্রাণের আবেগে জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? কঠিন প্রশ্ন। মহর্ষির সুদীর্ঘ জীবনে আর কখনো এমন কঠিন প্রশ্ন এমন অকুণ্ঠিতভাবে কেউ জিজ্ঞাসা করেন নি। সেদিন তিনি এর কোন সোজা জবাব দেননি। নরেন্দ্র-নাথকে সাদরে কাছে বসিয়ে বিস্ময়ের স্বরে বলেছিলেন, দেখ, তোমার চোখ যোগীর মত। তুমি খুব করে ধ্যান করো।

আকাশ ও সমুদ্রের মিলন

নরেন্দ্রনাথ মহর্ষির কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। মহর্ষি কি তা হলে ভগবানকে দেখেন নি? তিনি নিজের মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন, তবে কোথায় গেলে তাঁর উত্তর মিলবে? কে তাঁর দ্বন্দ্বের শেষ করে দিতে পারেন? কার কাছে আছে শান্তির উৎস? কে তাঁকে বলে দেবেন, পন্থা কি? মনের মানুষের সন্ধানে ক্রমেই তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলেন।

এদিকে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবেরও সেই অবস্থা। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে একদিন নরেন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল। তখন প্রায় ১৮৮১ খৃঃ নভেম্বর মাস। তাঁর ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে সেদিন তিনি এসে-ছিলেন। সুরেন্দ্র পাড়ার ছেলে নামজাদা গাইয়ে নরেনকে গান গাইবার জন্যে নেমতন্ন করেছিলেন। নরেন যথাসময়ে এসে হাজির হলেন। নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই। মাথার চুল কিংবা বেশভূষার পারিপাট্য

নেই। চোখ দুটি অন্তর্মুখী। তাঁকে দেখবামাত্র পরমহংসদেবের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাশের ভক্তদের কাছে সাগ্রহে তিনি যুবকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তারপর নরেন্দ্রনাথকে গান গাইতে অনুরোধ করেন। নরেন্দ্রনাথ তখন বেশি বাংলা গান জানতেন না। তাই ব্রাহ্মসমাজের "মন চল নিজ নিকেতনে" গানটি গান। গাইতে গাইতে গানের মধ্যে আত্মহারা হয়ে মনপ্রাণ ঢেলে দেন। গান যেন উৎসারিত হয়ে ওঠে তাঁর ভিতর থেকে। রামকৃষ্ণদেব আর স্থির থাকতে পারেন নি, ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন।

গান শেষ হলে তিনি হঠাৎ নরেন্দ্রের হাত ধরে একান্ত স্নেহের সুরে বলতে লাগলেন, এতদিন পরে আসতে হয়! আমি তোর জন্যে কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি তা কি জানিস? বিষয়ী লোকের বাজে কথা শুনতে শুনতে যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আনন্দে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। অনেক দিনের হারানো ধনকে হঠাৎ যেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তারপর নরেন্দ্রের সামনে ভক্তিভরে জোড়হাত করে বলতে লাগলেন, হে প্রভু, হে ঋষি, হে নররূপী নারায়ণ, আমি জানি জীবের দুর্গতি দূর করতে আবার তুমি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছ। নরেন তো অবাক। এ কি অদ্ভুত কথা। তিনি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথের পুত্র নরেন্দ্রনাথ—তাঁর সম্বন্ধে এ সব কি আজগুবি ধারণা!

এম্নি নানাকথায় কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর রামকৃষ্ণ যত্ন করে নরেনকে মাখম, মিছরি আর সন্দেশ খেতে দিলেন। নরেন বললেন, আমাকে দিন বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাব। কিন্তু রামকৃষ্ণ ছাড়বার পাত্র নন্। তিনি বললেন, সে ওদের দেবখন। তুই খা না। শেষে বিশেষ পীড়াপীড়ির ফলে নরেনকে একে একে সব খেতে হল। খাওয়া হয়ে গেলে পরমহংসদেব বললেন, বল্, শিঘ্‌ঘির আর একদিন আমার কাছে আসবি—দক্ষিণেশ্বরে। নরেন্দ্র প্রথমে রাজি হন নি। শেষে অনুরোধ এড়াবার জন্যে বললেন, আচ্ছা আসব।

বহুদিন নরেন্দ্রের সে প্রতিশ্রুতি রাখা হয় নি। প্রথম সাক্ষাতে পরমহংসদেব যেমন সহজে তাঁর একান্ত স্নেহের ধনকে চিনতে পেরেছিলেন, কলকাতার বড় ঘরের ছেলে, ইংরেজি-শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ তত সহজে তাঁর গুরুকে চিনতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর মনে হয়েছিল পাগল। অবশ্য এই পাগলের ভাবের মুখে তত্ত্বপূর্ণ কথা-বার্তা শুনে তিনি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। কিন্তু এঁর চালচলন, হাবভাব নরেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতের। তাই সেদিন দ্বিধাসন্দিগ্ধ মনে তিনি সুরেন্দ্র-নাথের বাড়ী থেকে বিদায় নেন।

এদিকে দক্ষিণেশ্বরে বসে পরমহংসদেব প্রিয়ের আশায় দিনের পর দিন গুনছেন। প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘণ্টা

যেন প্রতীক্ষায় কাতর হয়ে থাকে। আজ আসেনি, হয়ত কাল আসবে। সময়ে সময়ে বুকের মধ্যে আবেগ চেপে রাখা যায় না। গামছা নিঙড়াবার মত যন্ত্রণা হতে থাকে। কখনো কখনো বাগানের মধ্যে ছুটে গিয়ে ভিতরের রুদ্ধ আবেগ বাইরে প্রকাশ করে শান্ত হন, চেঁচিয়ে ডাকেন, ওরে আয়রে, তোকে না দেখে আর যে থাকতে পারছি না।

রাজধানীর ভিড়ের মধ্যে বিবেকানন্দ তখন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় গেলে মনের মানুষ মিলবে। নদীর এপার ডাকে ওপারকে, ওপার ডাকে এপারকে। বলে, কবে তুহুঁ মিলে এক হব ? মাঝখানে বয়ে যায় বিচ্ছিন্নতার খরস্রোত। মিলনের সত্যিকার মুহূর্ত না এলে এক অপরকে দেখেও চিনতে পারে না। এই সময়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন তাঁর স্মরণ হল দক্ষিণেশ্বরের কথা। তিনি স্থির করলেন, প্রতিশ্রুতি মত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা করবেন।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী যে কলকাতা থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে সে ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন, বরাহনগর থেকে কিছুদূর গেলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু যতই হাঁটেন পথ আর ফুরোয় না। রাস্তা সঠিক জানা ছিল না, লোককে জিজ্ঞেস করে করে এগোতে লাগলেন। মন যখন একবার ছুটেছে, তখন কে তাঁর

গতি রোধ করবে! বাধা আর তাঁর কাছে বাধা বলে মনে হয় না। ভগীরথ চলেছেন গঙ্গার সন্ধানে,—বহুদিন পরে উপকথার প্রবাসী রাজপুত্র ফিরে আসছেন "নিজ নিকেতনে"। আলে-বাঁধা বন্যার জল মুক্তির টানে ফিরে চলেছে নদীর গর্ভে।

রামকৃষ্ণদেবের ঘরে এসে যখন নরেন্দ্রনাথ পৌঁছলেন, তখন তিনি একলা বসেছিলেন তাঁর ছোট খাটখানিতে। ঘরে আর কেউ ছিল না। আপন মনে বসে কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ নরেনকে দেখতে পেয়ে মুখে তাঁর খুশির রেখা ফুটে উঠল। মধুরস্বরে কাছে ডেকে তাঁকে বসালেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, রামকৃষ্ণ যেন কি এক গভীর ভাবে তন্ময় হয়ে পড়েছেন আর নিজের মনে অস্ফুটস্বরে নানা কথা বলতে বলতে তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন। নরেন্দ্রের সংশয়ী মন। তিনি ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই পাগল। আগের দিনের মত আবার পাগলামি করবে।—তাঁকে আদর করবে, নররূপী নারায়ণ বলে প্রণাম করবে। একে একে সেদিনের সব কথা মনে পড়তে লাগল। হঠাৎ পাগল এগিয়ে এসে ডান পা দিয়ে তাঁকে ছুঁতেই তিনি যেন কোন্ ঊর্দ্ধলোকে উঠে গেলেন। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। তিনি চোখ চেয়ে দেখতে লাগলেন, দেয়ালগুলোর সঙ্গে ঘরের সব কিছু

ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ লীন হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বসংসার যেন দূরে—আরো দূরে ক্রমশ শূন্য হয়ে মিলিয়ে আসছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আমিও যেন সেই সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হয়ে ছুটে চলেছে। তাঁর মনের অদ্ভুত অবস্থা। বোধ আছে অথচ পুরো চৈতন্য নেই। ইচ্ছাশক্তি অসাড়। তাঁর মনে হল, আমিত্বের নাশই মৃত্যু। তিনি যেন আসন্ন মৃত্যুর কবলে দ্রুত ছুটে চলেছেন। মৃত্যুর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সংসার তাঁকে সবলে আকর্ষণ করলে। মাটির টান যে মানুষের ঘুচেও ঘোচে না। বাবা, মা, বন্ধু, স্ত্রী, সন্তানরূপে সে সহস্র বাঁধনে আত্মাকে জড়িয়ে রেখেছে। বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে সেই মায়া অমৃত-পাত্রের শেষ লেশটুকু নিয়ে হাজির হয়। মৃত্যুর চিন্তায় ক্লিষ্ট নরেন্দ্রেরও তাই হল। রামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ভয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ওগো, তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন! তাঁর কথা শুনে পাগল খলখল করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললেন, তবে এখন থাক। একবারে কাজ নেই। কালে হবে। বলতে বলতে নরেনের বুকে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর কোমল স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সব অনুভূতি অচিরে দূর হল। তিনি নিজের মধ্যে আবার নিজেকে ফিরে পেলেন। ভাল করে চেয়ে দেখলেন, ঘরের ভিতরে বাইরে কোথাও কিছু বদল হয় নি,—যেখানকার যা সব ঠিক আছে।

প্রকৃতিস্থ হবার পর নরেন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি ভাবতে লাগলেন, কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই মানুষটির ইচ্ছায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কি অভূতপূর্ব অনুভূতি এল আবার চলে গেল। মেসমেরিজম্ বা হিপ্নো-টিজম্-এর বিষয় বইএতেই পড়েছিলেন। নরেন্দ্র একবার ভাবলেন, এও হয়ত তাই। আবার ভাবলেন, না, তা হতে পারে না। কারণ, যার দুর্বল মন সে-তো হয় সম্মোহনে বশীভূত। কিন্তু তিনি তো দুর্বল নন। বরং অসামান্য মানসিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার জন্যে তাঁর মনে মনে আছে অহংকার। তা ছাড়া, সাধারণ মানুষ যেমন সম্মোহনের বলে যাদুকরের হাতের পুতুল হয়ে পড়ে, তিনি তো তা হননি। বরং তাঁর সংশয়ী মন রামকৃষ্ণকে সন্দেহের চোখেই দেখেছেন। অথচ তাঁর স্পর্শের গুণে তিনি এমন হয়ে পড়লেন কেন? ভেবে নরেন্দ্রনাথ কূল-কিনারা পেলেন না। শেষে মনে মনে সতর্ক হয়ে রই-লেন, পাগল যেন যোগবলে ভবিষ্যতে আবার তাঁকে এম্নি ধারা না করে দেয়।

কিন্তু সতর্ক হয়েও তাঁর নিস্তার নেই। ভাবতে ভাবতে ক্রমে তাঁর চিন্তাধারা উল্টোদিকে বইতে থাকে। যে লোক এত সহজে তাঁর মত মনের দৃঢ় সংস্কার ভেঙে চুরে দিয়ে এমনভাবে অদ্ভুত অনুভূতি জাগাতে পারেন, তাঁর বিপুল শক্তিকে অস্বীকার করি কেমন করে। অথচ

পাগল ছাড়াই বা ইনি কি। যিনি আমাকে নররূপী নারায়ণ, প্রাচীন ঋষি বলে নমস্কার করেন তাঁকে পাগল বলব না তো কি বলব। অথচ ভণ্ডামি এঁর নেই,—ছোট ছেলের মত সরল। সাধনার সিদ্ধির জন্যে ইনি সংসারের সব কিছু ত্যাগ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ চিরদিন যুক্তির সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করার পর কোন কিছু সম্বন্ধে শেষ মতামত গড়তেন। তাই রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে সহজে কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারলেন না। কেবলি তাঁর মনে একটা দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। তিনি স্থির করলেন যেমন করে হোক, এই অদ্ভুত মানুষটিকে যথাযথ-ভাবে বোঝবার চেষ্টা করব—নিতান্ত পাগল বলে আর উড়িয়ে দেব না। রামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে আর সামান্য মানুষ নন—তিনি তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। সে শক্তি যতই দুর্বোধ্য হোক তবু উনবিংশ শতাব্দীতে তার তুলনা নেই।

নরেন্দ্রের ভিতরে যখন এইসব নানা ভাবনা বিদ্যুৎ গতিতে খেলে যাচ্ছে তখন রামকৃষ্ণের আদর যত্নের শেষ নেই। তিনি একেবারে বদলে গেছেন—আর আগেকার যাদুকর নেই। তিনি যেন নরেনের অনেক দিনের পরি-চিত পরমাত্মীয়। বহুদিন পরে যেন তাঁদের দুজনের দেখা সাক্ষাত হয়েছে। সহরের এই ছেলেটিকে খাইয়ে আদর করে তার সঙ্গে কথা কয়ে রঙতামসা করে যেন তাঁর আর

আশ মেটে না। সারাদিন এম্নিভাবে কেটে গেল। বিকাল বেলা নরেন্দ্র বিদায় চাইলেন। রামকৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, বল্, আবার শিঘ্‌ঘির আসবি। এবার ছেলেটি সহজেই প্রতিশ্রুতি দিলে, হ্যাঁ, আসব।

কলকাতায় ফিরে নরেন্দ্র এবার বেশিদিন থাকতে পারেন নি। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। মনকে তিনি আগে থেকে শক্ত করে বেঁধে এসেছিলেন।—যাদুকরের সম্মোহনে আজ কিছুতেই ভুলবেন না। এই ছিল তাঁর সংকল্প। কিন্তু এবারেও তাঁর সে সংকল্প রাখতে পারেন নি। রামকৃষ্ণদেব সেদিন তাঁকে শ্রীযুক্ত যদুনাথ মল্লিকের পাশের বাগানে নিয়ে যান। সেখানে দুজনে কিছুক্ষণ বেড়াবার পর হঠাৎ রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। নরেন্দ্রনাথ গভীর বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন এমন সময়ে তিনি তাঁকে ছুঁয়ে দেন। মুহূর্তের মধ্যে নরেনের বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পায়। আগে থেকে কত সতর্কতা তিনি অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু কাজের কালে কোন ফলই হল না। কিছুক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য ফিরে এলে দেখতে পেলেন রামকৃষ্ণের মুখে মৃদু মৃদু হাসি, তিনি তাঁর বুকে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

সেদিন সুযোগ পেয়ে গুরু শিষ্যের কাছ থেকে তার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নেন—কে সে, কেন এসেছে, ভবিষ্যতে কি করবে সে। অনেকদিন আগে

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁর এক দর্শন লাভ হয়। তিনি দেখেছিলেন, জ্যোতিষ্মান সমাধি পথে তাঁর মন এগিয়ে চলেছে। গ্রহ-তারা-ঘেরা স্থূল জগত অতিক্রম করে ক্রমে তা পৌঁছল সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে। স্তর থেকে উচ্চতর স্তরান্তরে যতই তিনি উঠতে লাগলেন ততই নানা দেবদেবীর বিচিত্র ভাবঘন মূর্তি পথের দুধারে রয়েছে দেখতে পেলেন। ক্রমে ভাবরাজ্যের চরম সীমায় এসে তিনি উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন, একদিকে খণ্ড আর একদিকে অখণ্ডের রাজ্য। আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আলোক রেখার বেড়া। সেই বেড়া ডিঙিয়ে তার মন অখণ্ডের রাজ্যে এসে ঢুকল। সেখানে মূর্তির বালাই নেই। দিব্য দেহধারী দেবদেবীরা পর্যন্ত সেখানে উঠতে সাহস করেন না। পর মুহূর্তেই শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ল আর একদিকে। তিনি দেখলেন, সেই অখণ্ডের নিরালা রাজ্যে দিব্যজ্যোতিঘনতনু সাতজন ঋষি সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে এঁরা মানুষ তো দূরের কথা দেবদেবীদের পর্যন্ত অতিক্রম করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হয়ে এঁদের বিরাট মহত্ত্বের কথা ভাবছেন, এমন সময়ে দেখতে পেলেন সামনের অখণ্ডের ঘরের অবিচ্ছিন্ন, ভেদবিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের এক অংশ ঘনীভূত হয়ে এক দেবশিশুর মূর্তিতে পরিণত হল। সেই দেবশিশু ঐ সাতজন

ঋষির একজনের কাছে নেমে এসে নিজের সুললিত বাহু দিয়ে গভীর প্রেমে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলেন। পরে বীণার চেয়েও মধুরতর কণ্ঠে অমৃতময়ী বাণী উচ্চারণ করে ঋষিশ্রেষ্ঠকে সমাধি থেকে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রেমের কোমল স্পর্শে তাঁর সমাধি ভাঙল। তিনি একমনে সেই অপূর্ব শিশুকে দেখতে লাগলেন। চোখ তাঁর আধ-খোলা,—দৃষ্টি পলকহীন। তাঁর মুখের রেখায় রেখায় খুশির ভাব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হল, শিশু যেন তাঁর অনেকদিনের পরিচিত, একান্ত হৃদয়ের ধন। দেবশিশু তখন অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করে তাঁকে বলতে লাগলেন, আমি যাচ্ছি, তোমাকেও আসতে হবে আমার সঙ্গে। ঋষি সে অনুরোধ শুনে কোন কথা বললেন না। প্রেমে ঢলঢল চোখের দীপ্তিতে ব্যক্ত হল অন্তরের নিগূঢ় সম্মতি। পরে সস্নেহে শিশুর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হয়ে দেখলেন, সেই সমাধিমগ্ন পুরুষের শরীর মনের এক অংশ প্রখর জ্যোতির আকারে বিলোমমার্গে পৃথিবীতে নেমে আসছে।

আজ সংজ্ঞাহীন নরেনের কাছে প্রশ্ন করে তিনি জানতে পারলেন, যে সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছিল তা-ই সত্যি। নরেন সেই প্রবীণ ঋষি আর তিনি হচ্ছেন দেব-শিশু। পৃথিবীতে নরেনের মেয়াদ বেশিদিনের নয়। সে

যে কে তা সে আজো জানে না। যেদিন জানতে পারবে সেদিন আর তাকে মাটির দেশে আটকে রাখা যাবে না। আকাশের বিদ্যুৎকে কে কবে জড়ের রাজ্যে আটকে রাখতে পেরেছে। আলোর রেখা অচিরে আলোর দেশেই ফিরে যাবে।

উপর্যুপরি দুবার এই আলৌকিক অনুভূতির পর নরেনের মনে আজ আর কোন সন্দেহ রইল না। এতদিন পরে তিনি বুঝতে পারলেন, দক্ষিণেশ্বরের এই পাগল সত্যিকার পাগল নয়। বরং পাগলের পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র লোক। ইতিহাসে এই মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। তাঁর ইংরেজি শিক্ষার অন্ধ অভিমান দূর হল, মনের সংশয় ঘুচে গেল। রামকৃষ্ণদেবকে তিনি জীবনে স্বীকার করে নিলেন। তিনি যে প্রশ্ন মহর্ষিকে করেছিলেন ইতিমধ্যে একদিন পরীক্ষার ছলে এঁকেও সে প্রশ্ন করতে ভোলেন নি। জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? তাঁর কথা শেষ হবার আগেই শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে উত্তর বেরিয়ে এসেছিল, হ্যাঁ, ভগবানকে দেখেছি। যেমন তোকে দেখছি তেমনভাবে তাঁকেও দেখতে পাই। তুই যদি চাস তোকেও দেখাতে পারি। আজ নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, এই মানুষ সত্যিই তাঁর দ্বন্দ্বের শেষ করে দিতে পারেন। এঁর জীবনেই আছে তাঁর সকল প্রশ্নের মীমাংসা।

এতদিন পরে সত্য পেলে তার প্রকাশের আধার। একের বিচ্ছিন্ন দুই খণ্ডাংশ এসে আবার সম্মিলিত হল একে। অনেকদিন আগেই আকাশ ডাক দিয়েছিল সমুদ্রকে। সমুদ্র সে ডাক এতদিন শোনে নি—নিজের ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতায় নিজের মধ্যে ব্যর্থ হয়ে গুমরে মরছিল। আজ তাদের মিলন হল।

*

*   *

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা মনে হলে মনে পড়ে আকাশ ও সমুদ্রকে। চেহারা আর প্রকৃতি দুয়েতেই তাঁদের ছিল সম্পূর্ণ অমিল। রামকৃষ্ণ দেখতে ছিলেন ছোটখাটো, গড়ন মাঝারি, ধীর চালচলন, মুখে তেজের দীপ্তির চেয়ে বেশি ছিল আনন্দের প্রশান্তি। নরেন্দ্রের ছিল লম্বা চেহারা, বলিষ্ঠ শরীর, চওড়া ছাতি, তাতারি চোয়াল, চোখ দুটি ফোটা পদ্মের মত বড় টানা-টানা, মুখ ক্ষাত্রতেজে প্রখর। কিন্তু বাইরের চেয়ে ভিতরের রূপে তাঁদের আরো ছিল অমিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃতির মুলে ছিল বিশাল আকাশের গভীর স্থৈর্য। আর স্বামীজির চরিত্রে ছিল বিরাট শক্তির দুর্নিবার প্রকাশ। একজন প্রকৃতি আর একজন পুরুষ। তাঁরা জন্মেছিলেন যেন পরস্পরের বিপরীত হয়ে। সেই বৈপরীত্যের নিবিড় মিলন একদিনে ঘটে নি। দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয় সাক্ষাতের

পর নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও সহজে শিষ্যত্ব নেন নি। তাঁর উগ্র পৌরুষ তরুণ যৌবনে কারো কাছে শিষ্য হিসাবে মাথা নোয়াতে পারত না। চিন্তা-রাজ্যে তিনি ছিলেন জন্মবিদ্রোহী। প্রচলিত যা কিছু সব তিনি নিজে মীমাংসা করে নিতেন—কারো কথায় তিনি চালিত হতেন না। জীবনে কোন জিনিসই তিনি নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারতেন না। তাই ক্রমশ যতই তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছাকাছি এসেছেন ততই তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন। কখনো কখনো গুরুর দৃঢ়-ধারণা নিয়ে নির্মমভাবে উপহাস করেছেন। গুরু যখন যা বলেছেন তিনি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছেন,—মনে সংশয় জাগলে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে একটুও দ্বিধা করেন নি।

রামকৃষ্ণের হৃদয়ে ছিল নরেন্দ্রের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা। শিষ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তিনি বলতেন, নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই। এক একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল। কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। অন্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হতে পারে। নরেন্দ্র জালা।—খুব আধার, অনেক জিনিস ধরে।

বড় ফুটোওলা বাঁশ।—ও কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয় সুখের বশ নয়।—পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়, মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।*

নরেন্দ্রের মধ্যে ছিল কি বিপুল সম্ভাবনা তা তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তিনি কখনো বলতেন, ওরা নিত্যসিদ্ধ, ওরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতাল-ফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়।—নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা। সব পাখির ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনো সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।—সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের ওপর বসে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় না।†

গুরু শিষ্যকে কোনদিন আপন পথে জোর করে গড়বার চেষ্টা করেন নি। তাঁকে দিয়েছিলেন অখণ্ড

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৫ম, পরি।

† শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম, পা ৯৯।

স্বাধীনতা। সজীব মানুষ কেমন করে গড়তে হয় তিনি জানতেন। মালি যেমন ফুলগাছের চারাকে শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করে, তার বিকাশের সহজগতিকে বাধা দেয় না, রামকৃষ্ণদেব ছিলেন তেমনি কুশলী শিল্পী। তিনি অপেক্ষা করতে জানতেন। নরেন্দ্র তাঁর কাছে এসেছিলেন একটা তাল পাকানো শক্তির পিণ্ডের মত। ভবিষ্যত জীবনের মত বা পথ কিছুই তখনো তাঁর মধ্যে পরিণতি পায় নি। শুধু ছিল সত্য সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দুর্জয় আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভীক আন্তরিকতা। দীর্ঘ দিন ধরে ধীরে ধীরে গুরু শিষ্যকে ভবিষ্যত কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন।

নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে পড়ে গুরুবাদ মানতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথমে তিনি কিছুতেই অবতার বলে মানতে রাজি হন নি। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, হাজার লোক আপনাকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয় ততক্ষণ বলব না।

পরমহংসদেব জবাব দিয়েছিলেন, অনেকে যা বলবে তাই তো সত্যি।

শিষ্য বলেছিলেন, নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনব না।

ঈশ্বর নিরাকার এবং অদ্বিতীয়—এই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই নানা দেবদেবীর পরিকল্পনা বা মূর্তিপূজাকে

তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পরমহংসদেবের ওপর অটুট শ্রদ্ধা থাকলেও অনেকদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর ইষ্টদেবী শ্রীশ্রীভবতারিণীকে স্বীকার করেন নি। 'মা যে এই সব দেখিয়ে দিলেন', 'মা যে এই সব বলে দিলেন রে' বলে নরেনের কাছে রামকৃষ্ণ সহজে নিষ্কৃতি পেতেন না। নির্ভীক শিষ্য মনের সন্দেহ খোলাখুলি ব্যক্ত করতেন, আপনি ঈশ্বরের রূপটুপ যা দেখেন, ওসব মনের ভুল।

কথা কয় যে রে! গুরু জবাব দিতেন।

শিষ্য তবু সন্দেহের সঙ্গে বলতেন, ও অমন হয়।

একবার নরেন্দ্রের কথায় গুরুর মনেও সংশয় জাগল। কিন্তু তিনি নাছোড়-বান্দা। তাঁর কাছে এ যে প্রত্যক্ষ সত্যের মত, কেমন করে মায়া স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেবেন। সংশয়াকুল মনে শেষে তিনি মাকেই জিজ্ঞাসা করলেন। মার অভয় বাণী শুনে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন, ওর কথা শুনিস্ কেন? কিছুদিন পরে ও সব সত্যি বলে মানবে।

দক্ষিণেশ্বরে চার পাঁচ বছর ধরে দিনের পর দিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় পরমহংসদেব নরেন্দ্রের সঙ্গে নানা মধুর আলোচনায় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। একটির পর একটি করে তাঁর সাধনজগতের নানা রহস্যময় উপলব্ধির কথা তিনি বলতেন। সূক্ষ্মপথে ধীরে ধীরে বিকশিত হত শিষ্যের অন্তরাত্মা। আকাশ ও সাগরের এই ভাব বিনিময় যেমনি

নিবিড়, তেমনি গোপন। নরেন্দ্রনাথ অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। একদিন কথা প্রসঙ্গে গুরু অদ্বৈত বিজ্ঞানের জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। শিষ্য মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন বটে কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন বন্ধুর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে করতে বলতে লাগলেন, তা কি কখনো হতে পারে? তাহলে ঘটীটাও ভগবান, বাটীটাও ভগবান। এই বলে অট্টহাসি করে উঠলেন। তাঁর হাসি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের মত পরনের ধুতিখানি বগলে করে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোরা কি বলাবলি করছিস রে? কথা বলতে বলতে তিনি নরেন্দ্রকে ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

স্বামীজি বলতেন, ঠাকুরের সেদিনকার অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে ভাবান্তর ঘটে গেল। অবাক্ হয়ে দেখতে লাগলুম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই। এই অনুভূতির কথা কারোকে বললুম না—চুপ করে রইলুম। মনে মনে ভাবলুম, দেখি কতক্ষণ এ ভাব থাকে! কিন্তু সারাদিনের মধ্যে সে ভাব একটুও কমল না। বাড়ী ফিরে এলুম, তখনো সেই অবস্থা। চারিদিকে যা কিছু দেখছি সকলি তিনি—বোধ হতে লাগল। খেতে বসলুম। দেখি, খাবার তিনি, থালা তিনি, যিনি পরিবেশন করছেন তিনিও তিনি,— আমি নিজেও তিনি ছাড়া

আর কেউ নই। দু-এক গাল ভাত মুখে তুলেই চুপ করে বসে রইলুম। কতক্ষণ এম্নি ছিলুম জানি না। মা ডেকে বললেন, হাত তুলে বসে আছিস কেন্ রে, খা না। তখন হুঁশ হতে আবার খেতে লাগলুম। খাবার শোবার, বসবার—কলেজে যাবার সময়ও ঐ এক আচ্ছন্ন ভাব। রাস্তায় চলেছি গাড়ী ছুটে আসছে দেখছি কিন্তু অন্যদিনের মত ঘাড়ে পড়বার ভয়ে সরে যাবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। মনে হত, গাড়ীও যা, আমিও তা। হাত-পা এই সময়ে সর্বক্ষণ অসাড় হয়ে থাকত। খেতে কিছু মাত্র রুচি ছিল না। মনে হত যেন অপর কেউ খাচ্ছে। খেতে খেতে কখনো কখনো শুয়ে পড়তুম। কিছুক্ষণ পরে উঠে আবার খেতে শুরু করে দিতুম। ওরকম করায় এক একদিন অনেক বেশি খাওয়া হয়ে যেত। কিন্তু তার জন্যে কোনদিন অসুখ বিসুখ হয় নি। মা ভয় পেয়ে বলতেন, তোর দেখছি ভেতরে ভেতরে একটা বিষম অসুখ হয়েছে। কখনো বা বাড়ীর লোকদের লক্ষ্য করে বলতেন, ও আর বাঁচবে না। যখন আচ্ছন্নভাবটা একটু কমে যেত, তখন দুনিয়াটাকে স্বপ্ন বলে মনে হত। হেদোর বাগানে বেড়াতে গিয়ে লোহার বেড়ায় মাথা ঠুকে দেখতুম, যা দেখছি তা স্বপ্নের বেড়া না সত্যিকার। মাঝে মাঝে হাত পায়ের অসাড়তা দেখে ভয় হত, নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করতুম, পক্ষাঘাত হবে না তো? তারপর

কিছুদিন পরে যখন প্রকৃতিস্থ হলুম তখন ভাবলুম, এই তো অদ্বৈত তত্ত্বের আভাস। তাহলে শাস্ত্রে যা লেখা আছে, তা মিথ্যে নয়। সেই থেকে স্বামীজি অদ্বৈতবাদের ওপর আর কখনো সংশয় প্রকাশ করেন নি।

তাঁদের দুজনের মধ্যে ছিল অহেতুক ভালবাসার সুনিবিড় সম্বন্ধ। গুরু শিষ্যের কাছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করতেন না। তিনি ভালবেসেই খুশি ছিলেন। কিছুদিন নরেনকে না দেখলে তাঁর মন অধীর হয়ে উঠত। একবার তিনি শিষ্যকে দেখবার আশায় দক্ষিণেশ্বর থেকে সোজা কলকাতায় ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়ে হাজির হন। তাঁর ওপরে আগে থেকেই ব্রাহ্ম-নেতারা নানা কারণে বিরক্ত হয়েছিলেন। তাই সেদিন তাঁরা তাঁর সঙ্গে সাধারণ ভদ্রব্যবহার পর্যন্ত করতে পারেন নি। গুরুর লাঞ্ছনায় নরেন্দ্রের মনে তীব্র আঘাত লাগে কিন্তু রামকৃষ্ণদেব নিজের অপমান গ্রাহ্যই করেন নি। এমন কি শিষ্য তার জন্যে তাঁকে তিরস্কার করতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হন নি। নির্ভীকভাবে বলেছিলেন, পুরাণে আছে, ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে মরণের পর হরিণ জন্ম পেয়েছিলেন। আমার কথা অত করে ভাবলে পারে আপনারও তেম্নি পরিণাম হবে।

শিশু-স্বভাব গুরু এ কথা শুনে স্থির থাকতে পারেন নি। উদ্বিগ্ন মনে জবাব দিয়েছিলেন, ঠিক বলেছিস।

তাইতো রে, আমি যে তোকে না দেখে মোটেই থাকতে পারি না। শেষে তাঁর মার কাছে গিয়ে তিনি সান্ত্বনা পান। মন্দির থেকে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলেন, যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না। মা বললেন, তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস তাই তো ভালবাসিস। যেদিন ওর ভেতর নারায়ণ দেখতে না পাবি সেদিন আর ওর মুখ দেখতেও পারবি না।

গুরুর ওপর নরেন্দ্রের ভালবাসাও ছিল অপরিমেয়। কৌশলী গুরু তাঁর ভালবাসা পরীক্ষা করে নিতে ছাড়েন নি। একবার নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখলেন, হঠাৎ যেন সব সম্বন্ধ বদলে গেছে। আগে তাঁকে দেখতে পেলে শ্রীরামকৃষ্ণ দৌড়ে কাছে আসতেন—কত খুশি হয়ে আদর যত্ন করতেন। আজ তিনি এসে প্রণাম করলেন, ঘরের মধ্যে বসলেন কিন্তু রামকৃষ্ণ ফিরেও তাকালেন না। নরেন্দ্র ভাবলেন, হয়ত তিনি ভাবাবেশে আছেন। তাই বাইরে এসে কিছুক্ষণ অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে আগেকার মত তর্ক আলোচনা করে আবার ফিরে এলেন। তখনো সেই একভাব। গুরু কোন কথা বললেন না—মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন। এম্নি করে সারাদিন কেটে গেল। শেষে সন্ধ্যে হলে তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। পরের সপ্তাহে আবার এসে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন। রামকৃষ্ণদেবের সেই এক ব্যবহার।

এইভাবে চার পাঁচবার এলেন, ফিরে গেলেন। তবু দক্ষিণেশ্বরে আসা তাঁর বন্ধ হল না। গুরুর মন খুশি হয়ে উঠল,—নরেন সত্যিই তাঁকে ভালবাসে। একদিন তিনি ডেকে বললেন, আচ্ছা আমি তোর সঙ্গে একটা কথাও বলি না তবু এখানে তুই কি করতে আসিস ?

শিষ্য জবাব দিলেন, আমি কি আপনার কথা শুনতে আসি না কি ? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে। তাই বারবার ছুটে আসি।

বিকাশ

গুরুর পরীক্ষায় নরেন্দ্র সহজে উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু জীবন দেবতার পরীক্ষা তখনো বাকি ছিল। তা আরো কঠোর। নিষ্ঠুর তিনি। দুঃখ দিয়েই শুরু হয় তাঁর সঙ্গে মানুষের পরিচয়। দুর্দিনের ঘোর অন্ধকারে ঝলকে ওঠে তাঁর মুখের প্রসন্ন হাসি।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। তখনো নরেন্দ্রের বি-এ পরীক্ষার ফল বার হয় নি। হঠাৎ একদিন রাতে হৃদ্‌রোগে বিশ্বনাথ মারা গেলেন। নরেন্দ্র তখন বরাহনগরের একজন বন্ধুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেছলেন। খবর পেয়ে বাড়ীতে ছুটে এলেন কিন্তু বাবার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছল।

বিশ্বনাথ চিরদিন আয়ের বেশি খরচ করতেন। তাই বাবার মরণের পর নরেনদের সংসারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। কোন আয় নেই,—ঘরে জমানো টাকা নেই। অথচ পাঁচ সাতটি প্রাণী নিয়ে সংসার। আত্মীয়েরা সুযোগ পেয়ে থাকবার বাড়ীখানি পর্যন্ত কেড়ে নেবার

ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন এক নতুন জগতে। বড়লোকের ছেলে, তিনি চিরদিন আদর যত্নে মানুষ হয়েছিলেন। সংসারের ভাবনা যে কি তা কোনদিন জানতেন না। যা কিছু পিতৃঋণ ছিল সব শেষ করে তিনি চাকরির চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন। পায়ে জুতো নেই, পেট ভরে খাওয়া জোটে না। সামান্য বেশে দরখাস্ত হাতে দুপুরের রোদ মাথায় করে তিনি এক অফিস থেকে আর এক অফিসে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বিপদের দিনে একে একে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। একদিন যাঁরা তাঁকে সামান্য সাহায্য করতে পারলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতেন আজ তাঁরাই নিতান্ত অপরিচিতের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। বড়লোক বন্ধুরা কেউ কেউ অবশ্য তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নি। আগের মত তাঁদের মজলিসে গান গাইবার জন্যে নরেনকে সসম্মানে নিয়ে যেতেন। হয়ত তাঁদের কাছে সাহায্য চাইলে তাঁকে বিফলমনোরথ হতে হত না। কিন্তু দুর্গতির পর দুর্গতি ভোগ করে তাঁর মন হয়ে পড়েছিল স্পর্শকাতর। মুখ ফুটে নিজের অভাবের কথা বলা যে কঠিন। পুরুষসিংহ তিনি অপরের করুণার প্রত্যাশী হবেন কি করে!

দুঃখের জ্বালায় এক একদিন তাঁর মনে অবিশ্বাস

ঘনিয়ে উঠতে লাগল। কখনো কখনো ভগবানের বিরুদ্ধে অভিমানে হৃদয় ভরে যেত। একদিন পাশে বসে এক বন্ধু তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে গান শুরু করলেন,

"বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্ম নিশ্বাস পবনে—"

নরেন্দ্রনাথ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সারাদিন অন্নচিন্তায় ঘুরে ঘুরে কেটেছে। ক্ষোভে চীৎকার করে উঠলেন, নে, নে, চুপ কর্। ক্ষিধের জ্বালায় যাদের মা ভাইকে কষ্ট পেতে হয় না, টানাপাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের পোষায় ওরকম কল্পনা করা।

কিন্তু এ অভিমান ক্ষণিকের। ভগবানের ওপর একান্ত বিশ্বাস যে তাঁর ছেলে বয়সের সংস্কার। কয়েক-দিনের দুঃখের জ্বালায় কি তা নিঃশেষ হতে পারে। তিনি জানতেন, মঙ্গলময় তিনি, করুণাময় তিনি। বিলাসের পথে, ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে কে কবে তাঁকে জানতে পেরেছে। দুঃখ তাঁর দূত। বিপদ ঘনিয়ে তোলে তাঁর আসার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মের খর তাপের পর শুরু হয় আষাড়ের ঘন বর্ষণ। সর্বনাশের মধ্যে জেগে ওঠেন সর্বহারা শিব। না, না, কিছুতেই তিনি হতাশ হবেন না—নরেন্দ্র আত্মবিশ্বাসে বুক বাঁধতেন। আমাদের মধ্যে তিনি কিছুতেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে ডুবিয়ে দেবেন না। এই দুর্দিন তাঁর চিরদিনের নয়। নরেন্দ্রনাথ সেই আশায় নির্ভর করে রোজ সকালে ভগবানের নাম করতে

করতে বিছানা থেকে উঠতেন। এই বিশ্বাস আজো হারান নি বলেই এতদিন সকল আঘাত বুক পেতে নিতে পেরেছিলেন।

দিনের পর দিন কেটে যায়। ভোরের আলোর ক্ষীণতম রেখাও আকাশে ভেসে ওঠে না। মাটির প্রদীপে উৎসুক প্রতীক্ষা নিবু নিবু হয়ে পড়ে। এম্নি সময়ে একদিন ভোরবেলা তাঁর মুখে ভগবানের নাম শুনে ভুবনেশ্বরী দেবী আর স্থির থাকতে পারলেন না। ক্ষুব্ধ যন্ত্রণায় বলে উঠলেন, চুপ কর্ ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান, ভগবান। ভগবান তো তোর সব করলেন!

নিমেষে গর্জে উঠল সাগরের উত্তাল বিদ্রোহ। মার সামান্য দুটি কথা! তবু তাতেই নরেন্দ্রের বহুদিনের রুদ্ধ আবেগ হৃদয় তোলপাড় করে তুললে। এক মুহূর্তে ভেঙে গেল হিমালয়ের বজ্রকঠিন দৃঢ়তা। নরেন্দ্র আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। আঘাতের পর আঘাত খেয়েও এতদিন ধরে গড়ে তুলেছিলেন যে দুর্জয় বিশ্বাস, আজ একটি ভূকম্পনের আলোড়নে তা নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাঁর বিদ্রোহী মন গর্জে উঠল, ভগবান যদি দয়াময়, যদি মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের কবলে না খেতে পেয়ে লাখ লাখ লোক মারা যায় কেন? তিনি খোলাখুলি বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন, ভগবান নেই। যদি থাকেন তাঁকে করুণাময়

বলে কল্পনা করা পাগলের কাজ। তাঁর স্বভাবসুলভ আবেগের সঙ্গে প্রচলিত সব যুক্তি খণ্ডবিখণ্ড করে দিতে লাগলেন। নদীর বুকে একটা ঢেউ উঠলে তার আঘাতে ঢেউএর পর ঢেউ উঠতে থাকে। নরেন্দ্রের প্রকৃতি ছিল সেই রকমের। নিত্য ঘোরতর উৎসাহে তিনি নাস্তিকতা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

গতানুগতিক মানুষদল ভিতর দেখে না, দেখে বাইরেটা। শান্ত হয়ে বিচার করার শক্তি তাদের নেই। কিছুদিনের মধ্যে রব উঠল, নরেন্দ্র নাস্তিক হয়ে দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মদ খেয়ে বেড়াচ্ছে। এমন কি তাকে বেশ্যাবাড়ী যেতেও দেখা গেছে। নরেন্দ্রের নিন্দায় সমাজে ঢি-ঢি পড়ে গেল। এই মিথ্যা অপবাদে তিনি আরো কঠোর হয়ে উঠলেন। ডেকে ডেকে লোকদের বলে বেড়াতে লাগলেন, দুঃখ কষ্টের সংসারে মদ খেয়ে বা বেশ্যাবাড়ী গিয়ে যদি কেউ কিছুক্ষণের জন্যেও নিজের দুরদৃষ্টকে ভুলে থাকতে পারে তাতে অপরের গায়ের জ্বালা কেন ?

গুজব শুনে রামকৃষ্ণভক্ত কেউ কেউ নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, সব বিশ্বাস না করলেও কিছু কিছু তাঁরা বিশ্বাস করেছেন। অমনি তিনি অভিমানে জ্বলে উঠলেন, এতদিনের পরিচয় সত্ত্বেও আমার সম্বন্ধে এমনি হীন

ধারণা! তিনি উগ্র উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের শুনিয়ে দিলেন, ভীরু যারা, তারাই কেবল ভয়ে ভগবানে বিশ্বাস করে। আমি ওসব কিছুই মানি না। ভগবান নেই। এ কথা শুনে তাঁদের আগেকার বিশ্বাস দৃঢ়তর হল। অবজ্ঞাভরে তাঁরা বিদায় নিলেন। দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ নরেন্দ্রনাথের মুখে বাঁকা হাসির রেখা জেগে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ভয় হল, ওদের মুখে শুনে যদি রামকৃষ্ণদেবও বিশ্বাস করেন! তাহলে—। ক্ষণিকের উদ্বিগ্নতা। সমস্ত সংসারের মানুষদের নিন্দায় তাঁর কিছু এসে যায় না কিন্তু ঐ একটি মানুষের অবজ্ঞা তিনি সহ্য করবেন কেমন করে। মুহূর্ত পরে তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া শুরু হল। তিনি ভাবলেন, রামকৃষ্ণদেব যদি বিশ্বাস করেন, করুন। তাতে কি এসে যায়? মানুষের মতামতের দাম কতটুকু?

যথাসময়ে কথাটা রামকৃষ্ণদেবের কানে এল। এ হতেই পারে না,—তাঁর মন বললে। তবু তিনি মার মন্দিরে গিয়ে পরম স্নেহের ধনের সম্বন্ধে মনের উদ্বেগ জানালেন। তিনি যে নরেন্দ্রকে ভালভাবে জানেন, তার মধ্যে এ সব কি সম্ভব! কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে ভক্তদের ধমকে উঠলেন, চুপ্ কর্ শালারা। মা বলেছেন, সে কখনো ও রকম হতে পারে না। আর কখনো ও সব কথা বললে তোদের মুখ দেখতে পারব না।

ক্রমে গ্রীষ্ম শেষ হল, বর্ষা পড়ল। নরেন্দ্রের ভিতরে বাইরে দুঃসহ দ্বন্দ্ব। নাস্তিকতা নিয়েও তাঁর মনের অশান্তি ঘোচেনি ; দরজায় দরজায় ঘুরেও কোন কাজ জোগাড় করতে পারেন নি। একদিন রাতে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরছেন সারাদিন না খেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে তাঁর কেটে গেছে। শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। হঠাৎ মনে হল, পা আর একটুও এগোতে চায় না, কে যেন তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষে নিঙড়ে নিয়েছে। নিরুপায় হয়ে পাশের একটি বাড়ীর রকে বসে পড়লেন। চেতনা ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল! সেই অর্দ্ধঅচেতন অবস্থায় জীবনের নানা কথা মনের মধ্যে খেলা করে যেতে লাগল। দুঃখ, দুর্দশা, পীড়নে আজ ঘনিয়ে এসেছে তিমির রাত্রি। আজ আঁধার দেশের রাজার কি আসার সময় হল! "সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈব-শক্তি প্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেক-গুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম,

শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।"*

এই অনুভূতির পর তাঁর জীবনে গভীর পরিবর্তন এল। সংসারের সুখ, দুঃখ, নিন্দা প্রশংসার দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। মনে জাগল নির্লিপ্ততা—কোন কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে তাঁর আর ইচ্ছা নেই। এতদিন মনে হত, শক্তিমান হয়ে জন্মেছেন তিনি, দুঃখের তাড়নায় ভীরুর মত সংসার ছেড়ে যাবেন না। পয়সা উপায় করতে পারলুম না বলে বৈরাগী হব—এ চিন্তা তাঁর সহ্য হত না। আজ তিনি স্থির করলেন, জীবনের সত্যিকার ক্ষেত্রে পয়সা উপায়ের যোগ্যতা অতি সামান্য জিনিস। আর সাধারণ মানুষের মত পয়সা উপায় করার চেষ্টায় শক্তি ক্ষয় করবেন না। সাধারণ হয়ে তিনি জন্মান নি। পিতামহ দুর্গাচরণের মত তিনিও সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

সব ঠিক। যাবার দিন সকালে শুনলেন রামকৃষ্ণদেব কলকাতায় আছেন। ভাবলেন, ভালই হল, যাবার আগে একবার শেষ দেখা দেখে যাব। কিন্তু দেখা হতেই গুরু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, আজ আমার সঙ্গে তোকে দক্ষিণেশ্বরে যেতেই হবে। নরেন্দ্র কিছুতেই

*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব, পা, ২৪৫।

যাবেন না, নানা ওজর দিতে লাগলেন। কিন্তু গুরুও কোন কথা শুনবেন না। অগত্যা যেতে হল। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঘরে এসে সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শিষ্যের হাত ধরলেন, চোখ দুটি ছলছল, সমস্ত দেহের রেখায় রেখায় স্নেহ উপছে উঠছে। ব্যাকুল কণ্ঠে গাইতে লাগলেন :

"কথা কহিতে ডরাই,
না কহিতেও ডরাই,
আমার মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হারাই।"

নরেন বুঝতে পারলেন, গুরু তাঁর অন্তর্যামী। অনেক-দিনের জমানো চোখের জল তাঁর মনের কোনে জমে উঠেছিল। পুরুষমানুষ হয়ে কাঁদতে তিনি লজ্জা পেতেন। শত দুঃখেও চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ত না। আজ ভাল-বাসার স্পর্শে সেই পাষাণ চোখেও জল এল,—পূবে হাওয়ার পরশে গ্রীষ্মের আকাশে নামল বাদল।

রাতে আবার সকলকে সরিয়ে দিয়ে রামকৃষ্ণদেব বললেন, জানি আমি তুমি মার কাজের জন্যে এসেছ। সংসারে কিছুতেই থাকতে পারবে না। তবু এখন যাস্‌নি। আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্যে থাক্।

নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হবার সংকল্প আপাতত ত্যাগ করলেন। সংসারের অভাব দূর করবার জন্যে নতুন উদ্যমে আবার চেষ্টা চলতে লাগল। কিছু কাজ জুটলও। এটর্নি অফিসে সামান্য মাইনের কাজ পেলেন। কয়েকখানা বই অনুবাদ করেও কিছু উপায় হল। কিন্তু তাতো সাময়িক। তাছাড়া, সেই সামান্য আয়ের ওপর তো নিশ্চিন্তে নির্ভর করে থাকা যায় না। অথচ সারাদিন যদি টাকার চিন্তাই করবেন তবে সাধনার পথে এগোবেন কি করে।

একদিন তাঁর মনে হল, রামকৃষ্ণদেবের কথা তো ভগবান শোনেন। তিনি যদি একবার প্রার্থনা করেন, তাহলে মা ভাইদের আর খাবার কষ্ট থাকে না। তাঁকে কেন সেই অনুরোধ করি না। কথাটা মনে হতেই তাঁর হৃদয় হাল্কা হয়ে গেল, তাইতো এত সহজ উপায় থাকতে এতদিন কি কষ্টই না করেছি। সোজা দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনি গুরুকে মনের কথা জানালেন। রামকৃষ্ণদেব বললেন, ওরে ওসব কথা যে আমি বলতে পারি না। তুই নিজে মাকে জানা না কেন ? মাকে মানিস্ না, তাই তো তোর এত কষ্ট।

নরেন্দ্র বললেন, আমি যে তাঁকে জানি না। আপনি আমার হয়ে বলুন। আপনাকে বলতেই হবে। আমি কিছুতেই ছাড়ব না আজ।

গুরু জবাব দিলেন, কতবার তো বলেছিরে, মা নরেন্দ্রের দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও। তা তুই মাকে মানিস্ না, তাই তো মা শোনে না আমার কথা। আচ্ছা শোন্,—এক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভেবে তিনি বলে যান: আজ মঙ্গলবার। আমি বলছি, আজ রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন!

গুরু বলেছেন, নরেন্দ্রের আর অবিশ্বাস নেই। গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে তিনি প্রতীক্ষা করে রইলেন। রাত এক প্রহর কেটে গেলে গুরুর আদেশে শিষ্য মন্দিরে গিয়ে হাজির হলেন। পথে যেতে যেতে তাঁর পা টলতে লাগল। মনের মধ্যে একটা গাঢ় আচ্ছন্নভাব। উত্তে-জনায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ। মনে পড়ে, একদিন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, তাঁকে দেখা যায়। আজ সত্যিই কি মার দেখা মিলবে,—সত্যি তাঁর মুখের কথা শুনতে পাওয়া যাবে। মন্দিরে ঢুকতেই কি যেন একটা পাওয়ার আনন্দে ভরে উঠল তাঁর মন। তাঁর বিস্মিত চোখের সামনে ভেসে উঠল চিন্ময়ী প্রতিমা। সত্যিই তো মা জাগ্রতা। অনন্ত প্রেমসৌন্দর্য শক্তির উৎস তিনি। বিহ্বল হয়ে তিনি বারবার প্রণাম করে বলতে লাগলেন, মা আমায় বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও। নিয়ত যাতে তোমার দর্শন পাই এমন করে দাও।

ফিরে এলে গুরু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে মাকে বলেছিস্? হঠাৎ শিষ্যের হুঁশ হল, তাই তো যা বলতে গেছলেন, তা তো বলা হয় নি। মার কাছে তো টাকা কড়ি চাওয়া হয় নি!

গুরু বললেন, যা যা, ফের যা। গিয়ে মাকে জানিয়ে আয়।

নরেন্দ্র আবার মন্দিরের দিকে চললেন। ফিরে এলে বুঝতে পারলেন, এবারও তাঁর প্রার্থনা জানানো হয় নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তিরস্কার করে আবার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। যাবার সময় নরেন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এবার কিছুতেই আত্মবিস্মৃত হবেন না। কিন্তু মন্দিরে ঢুকেই তাঁর মনে হল, তিনি কি হীনবুদ্ধি। সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বজননী, চিৎশক্তিস্বরূপিনী। তাঁর কাছে কিনা খাওয়া পরার জন্যে প্রার্থনা। লজ্জায় ঘৃণায় তিনি সে কথা মুখে আনতে পারলেন না। কেবলই বলতে লাগলেন, আর কিছু চাই না, মা, কেবল আমায় জ্ঞান ভক্তি দাও।

অবশেষে দক্ষিণেশ্বরের পাগলেরই জয় হল। তাঁর মুখে মার কথা শুনে একদিন অবিশ্বাসী অট্টহাসি হেসে উঠতেন। বলতেন, ও সব মায়া স্বপ্ন, ও সব মনের ভুল। মাটির পুতুল কেমন করে চিন্ময়ী হতে পারে—তা তাঁর ধারণাতেই আসত না। আজ তাঁর সে অবিশ্বাস দূর

হল। চোখের সামনে তিনি দেখতে পেলেন জাগ্রতা বিশ্বশক্তি। তিনি দেখলেন, তিনি মুগ্ধ হলেন, নিজেকে তিনি সঁপে দিলেন সেই শক্তির পাদপদ্মে।

অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আঁধার রাতের পথহারা পথিকের ডানা ঝটপটানি ক্রমেই কমে আসছে। তার নীড়ে ফেরার বুঝি আর দেরী নেই। কিন্তু পথের আঁধার যে কেটেও কাটতে চায় না। এক-দিকে ঝাপসা আলো জাগে আর একদিকের ঘোর অন্ধকারে ক্ষণেক পরে তা মিলিয়ে যায়। সুদূর সে যে আজো সুদূরে। অরুণরাগের বিজয়মালা বিবেকানন্দের জীবনে সহজে মেলে নি।

*

* *

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গলায় ঘা দেখা দিলে। সহরের বিচক্ষণ কবিরাজেরা পরীক্ষা করে বললেন রোহিনী রোগ। শেষে গৃহীভক্তদের সাহায্যে কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে একখানা বাড়ী ভাড়া করে দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁকে সেই বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন। তিনি বললেন, খুব ভাল করে সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন। রোগীর রান্নার কাজকর্ম করার জন্য সারদা দেবী কলকাতায় চলে এলেন। কিন্তু রাত্তিরে

শুশ্রূষার ভার নেবে কে? গৃহীভক্তেরা অসুবিধায় পড়লেন। তাঁরা তো থাকতে পারেন না। অভিভাবকদের তাড়নার ভয়ে তরুণ শিষ্যেরাও এ দায়িত্ব নিতে সাহস করলেন না। শেষে নরেন্দ্রের কানে গেল। শুশ্রূষার কথা শুনেই তিনি এগিয়ে এলেন, উৎসাহ দিয়ে আরো চার পাঁচজন বন্ধুকে টেনে নিলেন। স্থির হল, তাঁরাই পালা করে রাত্তিরে রোগীর কাছে থাকবেন। নরেন তখন আইন পড়ছিলেন আর বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে সাময়িকভাবে শিক্ষকতা করছিলেন। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে মোকদ্দমা লেগেছিল। মাঝে মাঝে তারও তদ্বির করতে হত। কিন্তু সংসারে তাঁর আর মন ছিল না। গুরুর আকর্ষণে ক্রমশ তাঁর মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটছিল। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ডুব দাও। তা নাহলে সমুদ্রের ভেতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের ওপর শুধু ভাসলে কি তা মেলে? নরেন্দ্র তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণায় ক্রমশ অনুভব করছিলেন, বোঝাটাই বড় কথা নয়, জানাটাই আধ্যাত্মিকতার চরম আদর্শ। ঈশ্বরকে জানতে হবে,—সত্য অনুভূতির মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে। জীবনে সত্যকে লাভ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সেই আদর্শের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেই মহাপুরুষের অকুণ্ঠিত সেবায় নরেন্দ্র নিজেকে সঁপে দিলেন। মনে মনে তিনি বিচার

করলেন, মনুষ্যত্ব পেয়েছি, মনে মুমুক্ষত্বও জেগেছে,—আর এই দুর্লভ মানুষের আশ্রয়ও মিলেছে। যে কদিন তিনি পৃথিবীতে আছেন আর বাজে কাজে ঘুরে বেড়াব না। নরেন্দ্রনাথ একাগ্র হয়ে কঠোর সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিকতা লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিনি যে পরমহংসদেবের শিষ্যদের মধ্যে ব্যক্তিত্বে, চরিত্রবলে, মনুষ্যত্বে এবং মুমুক্ষতায় সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা এখন সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। গুরু ও অপর অপর শিষ্যদের মনে নরেন্দ্রের ওপর শ্রদ্ধা জাগাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর অবর্তমানে নরেনই হবেন তাঁদের পরিচালক—ভবিষ্যতে তাঁর কর্মযজ্ঞের নেতা। তিনি অকপটভাবে তাঁর বিরাট শক্তির কথা শিষ্যদের কাছে বলতেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপের পর ডাঃ মহেন্দ্র-লাল সরকার খুব মুগ্ধ হন। চিকিৎসা করতে করতে তিনি ক্রমশ রামকৃষ্ণদেবের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে তখন তাঁর নাম ডাক পশার খুব। সব সময়েই তাঁর কাজ, এক মুহূর্ত বিশ্রামের সময় নেই। কিন্তু পরমহংসদেবের কাছে এলে দু-তিন ঘণ্টা নানা আলোচনা না করে তিনি উঠতেন না। ভক্তদের মধ্যে নরেন্দ্রকে তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগত। একদিন তাঁর মুখে ভজন গান শুনে আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁকে আলিঙ্গন করে চুমু খেয়ে পরমহংসদেবকে বলেছিলেন, এর মত

ছেলে ধর্মের পথে এসেছে দেখে আমি খুব খুশি। এ একটি রত্ন, যাতে হাত দেবে তাতেই সোনা ফলবে। তাঁর কথা শুনে গুরুর মনে আনন্দ হয়েছিল। তিনি শিষ্যের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে ডাক্তারকে জবাব দিয়েছিলেন, কথায় আছে, অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন, সেই রকম ওঁর জন্যেই তো সব গো। জগতে তিনি এসেছেন নরেন্দ্রকে পরিপূর্ণ করার জন্যে—তাঁরা যে পরস্পরের পরিপূরক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, সহরের বদ্ধ হাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছে না। একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলে ভাল হয়। কাশীপুরে একখানা বাগান বাড়ী ভাড়া করা হল। রাম-কৃষ্ণ তাতে উঠে গেলেন। তাঁকে ঘিরে ক্রমশ গড়ে উঠছিল তরুণ ভক্তদের সংঘ। গুণতিতে তাঁরা প্রায় বার জন। বয়স কারো বেশি নয়। তাঁদের সারাদিন কাশীপুরের বাগানেই কাটে। আগে কেউ কেউ খাবার জন্যে বাড়ী যেতেন, এখন আর তাও যান না। গুরুর সেবা আর ধ্যান ধারণা করে দিন কেটে যায়। নরেন্দ্র তাঁদের নিয়ে কখনো ধর্ম সম্বন্ধে বই পড়েন, কখনো আলোচনা করেন। কখনো করেন এক সঙ্গে সাধন ভজন। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিদ্যুৎ শিখার মত। তার স্পর্শে দিনদিন সেই নানা মতের নানা উপকরণের তৈরি ছোট

দলটি একই সাধন পথে এগিয়ে চলতে লাগল। মনে তাঁর তীব্র বৈরাগ্য। মানুষের যখন হারাবার ভয় হয় তখনই জাগে প্রবল আগ্রহ। নরেন বুঝতে পেরেছিলেন, গুরুকে আর সংসারে বেঁধে রাখা যাবে না। মহাকাশের আহ্বানে আকাশ ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তাই তাঁর আর বিলম্ব সহ্য হয় না। একদিন শোবার আগে মনে মনে ভাবলেন, কাল বাড়ী গিয়ে মোকদ্দমার ব্যবস্থা করে আসব। দু-একদিন না হয় সেইখানেই থাকব। কিন্তু বিছানায় শুয়ে কিছুতেই তাঁর ঘুম এল না। তিনি উঠে পড়লেন। শরৎ, ছোটগোপাল প্রভৃতিকে ডেকে বললেন, আয় বাগানে বেড়াই। বেড়াতে বেড়াতে তিনি মনের আবেগ প্রকাশ করে বললেন, দেখ, ঠাকুরের অসুখ কিছুতেই ভাল হবে না। শরীর তিনি আর রাখতে চান না। এইবেলা যেটুকু সময় আছে তাঁর সেবা আর ধ্যান ধারণা করে যা পাবার পেয়ে নে। তিনি চলে গেলে তখন অনুতাপের শেষ থাকবে না। আমরা বোকার মতন ভাবছি, হাতের কাজ শেষ করে সাধন ভজন করব। আরে তা কি হয়! তাতে আরো বাঁধন বাড়ে। ওর গোড়া কেটে একেবারে শেষ করে দিই আয়। এই কথা-গুলো বন্ধুদের লক্ষ্য করে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে বলা। স্বামীজির প্রকৃতি ছিল এই রকমের। নিজেকে নিয়ে নিয়ত বিচার করতেন। তাই নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে

কোনদিন চোখ বুজে থাকতে পারতেন না। কথাগুলোর মধ্যে তাঁর সেই সময়ে মনে সাধনার জন্যে কি তীব্র ব্যাকুলতা জেগেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শীতের দিন। আকাশ ভরে তারার মালার ঝাপসা আলো। কথা বলতে বলতে সকলেরই মনে জাগল ধ্যান করার জন্যে তীব্র আগ্রহ। কিছুদূরে এক বোঝা শুকনো কাঠ পড়েছিল। নরেন বললেন, এতে দে আগুন। ঠিক এই সময়ে সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালে। এই আমাদের ধুনি। আগুনের চার পাশে বসে তাঁরা ধ্যান শুরু করে দিলেন।

এই সময়ে তাঁর মনে একটুও শান্তি ছিল না। ব্যাকুলতায় তাঁর মন আটুপাটু করতে থাকে। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারী মাস। মণির সঙ্গে একদিনের কথা-বার্তায় তাঁর ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গত শনিবার এখানে ধ্যান করছিলুম।—তিনি নিজের সম্বন্ধে মণিকে গল্প বলছেন: হঠাৎ বুকের ভেতর কি রকম করে এল।

মণি জবাব দিলেন, কুণ্ডলিনী জাগরণ।

নরেন্দ্র বললেন, তাই হবে। বেশ বোধ হল, ইড়া পিঙ্গলা। হাজরা পাশে ছিল, ডেকে বললুম, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ তো। রবিবার সকালে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে সব বললুম। বললুম, সবাএর হল, আমায় কিছু দিন।

মণি জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললেন তিনি?

—তিনি বললেন, তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে।

পরমহংস ছিলেন অতুলনীয় শিক্ষক। তিনি বেল ফুলের কুড়িটিকে টানা হেঁচড়া করে গাছ থেকে ছিঁড়ে আনেন নি। ধৈর্য ধরে অনেক দিন প্রতীক্ষা করে-ছিলেন। তিনি জানতেন, যে শাখায় কুঁড়ি ধরেছে, তা শুকনো। অচিরে একদিন তা ঝরে পড়বে। তখন তিনি নিজের চেষ্টায় মনের মত করে তাকে ফোটাবেন। তাই সহজে নরেন্দ্রকে ঘর ছাড়া করেন নি।

দু-একটি আরো কথা হবার পর সেদিন গুরু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই কি চাস?

শিষ্য জবাব দিয়েছিলেন, আমার ইচ্ছে, অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব। কখন কখন এক একবার খেতে উঠব।

রামকৃষ্ণ রাগ করে বললেন, তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। ও অবস্থার চেয়ে ঢের উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস্ মনে নেই, 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'?

নরেন্দ্রের মধ্যে এই সময়ে তীব্র বৈরাগ্যের উন্মেষ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন কোন ভক্তকে বলে-ছিলেন, নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য, দেখ্। এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানত না। ওর প্রাণ এখন কি রকম

আটুপাটু হয়েছে দেখছিস্! সেই যে আছে, একজন জিজ্ঞাসা করেছিল ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়? গুরু তা শুনে বললে, এস আমার সঙ্গে, তোমায় দেখিয়ে দিই কি হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিক-ক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিল? সে বললে, প্রাণ যায়-যায় হচ্ছিল। ঈশ্বরের জন্যে প্রাণ আটুপাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি নেই। পূবদিক লাল হলে বোঝা যায় সূর্যি উঠবে।

কঠোর সাধনার ফলে নরেন্দ্র ক্রমশই আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে চলেছিলেন। মহাশক্তির উৎস তাঁর মধ্যে দ্রুত জেগে উঠছিল। তখন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। শিবরাত্রির দিন। কাশীপুরের বাগানে একটি ছোট্ট ঘরে বসে নরেনরা চার পাঁচজন ভক্ত গল্প করছিলেন। সারাদিন উপোস করে সাধন ভজন করেছেন। সন্ধ্যেবেলা অল্প এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তারা-জাগা আকাশে ছু-এক টুকরো হাল্কা মেঘ এখনো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ নরেন্দ্রের ইচ্ছা হল কালীর ওপরে তাঁর শক্তি চালনা করে দেখবেন। তখন আর আর ভক্তেরা কাজের অজুহাতে উঠে গেছলেন। ঘরে ছিলেন তিনি আর কালী। তিনি বললেন, আমি ধ্যান করতে বসছি।

কয়েক মিনিট পরে আমাকে ছুঁবি। এই বলে দুজনেই ধ্যানের আসনে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী অভেদানন্দ ডান হাত দিয়ে তাঁর ডান হাঁটু ছুঁতেই হাতখানা কেঁপে উঠল।—যেন তীব্র ইলেক্ট্রিক শক লেগেছে। সেই স্পর্শের ফলে সেদিন মাঝরাতে ধ্যান করতে করতে অভেদানন্দ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব অনুভূতি উপলব্ধি করেছিলেন। পরমহংসদেব সে কথা শুনতে পেয়ে রাগ করেছিলেন। স্বামীজিকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, পুরো শক্তি পাবার আগে এম্নি করে শক্তি নষ্ট করতে আছে! আগে সবটা পা, তারপর কতটুকু খরচ করবি, কতটুকু রাখবি, মা সব বলে দেবেন। যাক্, যা হবার তা হয়েছে। আর কখনো এমন ধারা করিস্ নি।

মহাকাশের আহ্বান ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। পরমহংসের জীবনে মহাসমাধির বুঝি আর দেরী নেই। কথা আর তিনি বেশি বলতে পারেন না। গলা দিয়ে একদিন রক্ত উঠল। যন্ত্রণা মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। তবু তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গোকে শিক্ষা দেবার বিরাম নেই। পৃথিবীতে তিনি এসেছেন জীবের কল্যাণের জন্যে। সে দায়িত্ব দিয়ে যাবেন শিষ্যদের মাথার ওপর কিন্তু লোক শিক্ষার দায়িত্ব নেবার আগে চাই ব্রহ্মজ্ঞান,—চাই চাপরাশ। একদিন তিনি বললেন, চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য গঙ্গায় নেয়ে কাছ দিয়ে

যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি? সে বললে, ঠাকুর তুমি তো আমায় ছোঁও নাই আমিও তোমায় ছুঁই নাই। তুমি বিচার কর। তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি,—কি তুমি বিচার কর। শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। সত্ত্ব, রজঃ, তম তিন,—কোনগুণে লিপ্ত নয়।—ব্রহ্ম কি রকম জিনিস্? যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভাল গন্ধ—সব বায়ুতে আছে। কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।··· গুণাতীত। মায়াতীত। অবিদ্যামায়া বিদ্যামায়া দুয়েরই অতীত। কামিনী কাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি—এ সব বিদ্যার ঐশ্বর্য। শঙ্করাচার্য বিদ্যামায়া রেখেছিলেন। তারপর নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, তুমি আর এরা যে আমার জন্যে ভাবছ—এই ভাবনা বিদ্যামায়া। বিদ্যামায়া ধরে ধরে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যেমন সিঁড়ির ওপরের পইটে—তারপর ছাদ।···কেউ কেউ ছাদে পৌঁছানোর পরও সিঁড়িতে আনাগোনা করে, জ্ঞানলাভের পরও বিদ্যার আমি রাখে। লোকশিক্ষার জন্যে। আবার ভক্তি আস্বাদ করবার জন্যে—ভক্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্যে।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রাথমিক প্রয়োজন ত্যাগ। আসক্তির গ্রন্থি কাটতে না পারলে কিছুই হবে না। দিনের পর দিন নব নব চেতনার অনুভূতিতে নরেন্দ্রের

হৃদয় শতদল বিকশিত হয়ে উঠছে,—তাঁর জীবনে ত্যাগ গভীরতর হয়ে আসছে। ত্যাগ ছাড়া এখন আর কিছু ভাবতে পারেন না। তাই আজ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা উঠতে তিনি যেন গুরু ভাইদের শোনাবার জন্যে পরমহংসকে বললেন, কেউ কেউ রাগে আমার ওপর ত্যাগ করবার কথায়।

গুরু মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, ত্যাগ দরকার। নিজের শরীরের এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে বলতে লাগলেন, একটা জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলেও জিনিসটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়? তারপর আরো গভীর স্তরে গিয়ে বললেন, সেই-ময় দেখলে আর কিছু কি দেখা যায়?

ত্যাগ শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংসার ত্যাগের প্রশ্ন। নরেন্দ্রের আশঙ্কা, গুরুভাইদের কারো কারো মনে হয়ত সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে এখনো দ্বিধা আছে। তাই তিনি জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবেই?

গুরু জবাব দিলেন, যা আগে বললুম। সেই-ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায়?

পরমহংসদেব কথা বলতে বলতে নরেন্দ্রকে সস্নেহে

দেখছেন। রোগক্লান্ত মুখ তাঁর আনন্দের দীপ্তিতে ভরা। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, খুব।

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, খুব কি? মুখে তাঁর দুষ্টু হাসির রেখা।

গুরু হাসতে হাসতে বললেন, খুব ত্যাগ হয়ে আসছে।

পাশে রাখাল বসেছিলেন। তিনি গুরুর কথাটা স্পষ্ট করে বললেন, নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝছে।

একই সঙ্গে ভাঙাগড়া সৃষ্টির আদি-রহস্য। ভাগীরথীর এক তীরে চলে ভাঙন, আর এক তীরে শুরু হয় গড়ন। সন্ধ্যাকাশে একদিকে দিনের আলো নিভে যায়, আর একদিকে জেগে ওঠে চাঁদের হাসি। পরমহংসদেবের জীবনে মহাসাগরের আহ্বান যতই কাছে এগিয়ে আসতে থাকে বিবেকানন্দের জীবনে ততই আধ্যাত্মিকতা খরতর হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে একের অলৌকিক দায়িত্বের ভার এসে নামে আর একের মাথায়। শিষ্য অবশ্য নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে তখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরমহংসদেব একদিন এক টুকরো কাগজে লিখেছিলেন, "নরেন শিক্ষে দেবে।" নরেন্দ্র সে কথা জানতে পেরে অসম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন, আমি ওসব পারব না।

গুরুর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল অজানিতের বিধান। তাই তিনি জবাব দিয়েছিলেন, পারবি না কি? তোর হাড় করবে। তারপর অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গোদের

দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ তোর হাতে এদের সব দিয়ে গেলুম, দেখিস্।

নরেন্দ্রের কানে পৌঁচেছে গভীর অরণ্যের মর্মরধ্বনি। লোকালয়ের ভীড়ের গান আর তাঁর ভাল লাগবে কেন? তিনি চান জীবনে চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি—লোক শিক্ষক হতে চান না। গুরুকে তাই তিনি বারবার সেই চরম আনন্দের জন্যে ব্যস্ত করে তুললেন। একদিন হঠাৎ এল সেই উপলব্ধি। সন্ধ্যেবেলা ধ্যান করতে করতে তাঁর যেন মনে হল, মাথার পিছন দিকে একটা বিদ্যুৎ রেখা চমকে উঠল। কে যেন একটা টর্চ জ্বেলে দিয়েছে তাঁর মাথার মধ্যে। ক্রমশ সেই আলোর গোলাকার রেখা বড় হয়ে উঠতে লাগল আর তাঁর মন মিলিয়ে যেতে লাগল। তাঁর নিজের মধ্যে তিনি যেন আর নেই। দেহ যেন আলাদা হয়ে গেছে, শুধু মুখখানা জেগে আছে। সহসা তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে আমার শরীর কোথায় গেল? তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বুড়ো গোপাল কাছে ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রের অবস্থা দেখে ওপরে গুরুর কাছে ছুটে গেলেন। তিনি সব শুনে বললেন, থাক অমনি অবস্থায়। ইদানিং বড় জ্বালাতন করে মারছিল।

রাত ন-টার পর তাঁর বোধ ফিরে এল। ক্রমশ তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। এক অপরি-

সীম আনন্দের অনুভূতিতে তাঁর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। তিনি উঠে পড়লেন। তাঁর হৃদয় ভরপুর—বর্ষার জলভরা নদীর মত। বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের অনুভূতির মধ্যে আছে পরম শান্তি, সেখানে সব দ্বন্দ্ব হয় অবসান,—সব প্রশ্ন নিঃশেষ হয়ে আসে চরম মীমাংসায়। সেই অবস্থায় তিনি এসে গুরুর কাছে হাজির হলেন। গুরু বললেন, এখন টের পেলি? চাবি আমার কাছে রইল। তারপর অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, ও আপনাকে জানতে পারলে আর দেহ রাখবে না।

তিনি জানতেন, নির্বিকল্প সমাধির স্তরে পৌঁছলে নরেনকে দিয়ে দুর্গত সংসারের কোন কল্যাণ-কাজ আর করা যাবে না। মার কাজ শেষ না হলে যে নরেন্দ্রের নিস্তার নেই। তাই শেষ দিকে অত ব্যগ্রতার সঙ্গে তিনি তাঁকে কর্মযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করে-ছিলেন।

কিন্তু যে বিরাট কর্মব্রত সাধনের জন্যে নরেন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, তার উপযুক্ত শক্তি অর্জন করা তো সহজ-সাধ্য নয়। দীর্ঘ দিন তার জন্যে চাই কঠোর তপস্যা। অথচ সংসারের দুর্গতি দ্রুত এসে পৌঁচেছে তার চরম সীমায়। পৃথিবীর একদিকে পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জালে মানুষের এগিয়ে চলার পথ বন্ধ প্রায় আর একদিকে শক্তিহীন

মানুষ দল গভীর অবসাদে নিজেদের ভুলে এগিয়ে চলার পথের প্রান্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। আরো দেরি হলে শুভ-ক্ষণ বুঝি চলে যায়। মহাসমাধির কয়েক দিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন। নরেন্দ্র কাছে এসে বসলে তিনি ঘরের অন্যান্য সকলকে বাইরে যেতে বললেন। তারপর সামনা সামনি বসে নরেন্দ্রের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। শিষ্যের মনে হল যেন তড়িতের মত একটা শক্তি শিখা তাঁর শরীরে ঢুকছে—সঙ্গে সঙ্গে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান হল দেখলেন, পরমহংসদেব চুপ করে বসে আছেন, তাঁর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

—কাঁদছেন কেন?—নরেন্দ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

গুরু বললেন, বাবা আজ থেকে আমি ফকির হলুম। আমার যা কিছু সব তোকে দিয়ে দিয়েছি। এই শক্তির বলে তুই মার কাজ করবি। তোকে দিয়ে অনেক বড় বড় কাজ হবে। তারপর কাজ শেষ হলে যেখান থেকে এসেছিস সেখানে চলে যাবি।

যাবার বেলা গুরু শিষ্যের মধ্যে নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন নিজেকে। এ যাওয়া তো যাওয়া নয়। যাওয়ার মধ্যেই সৃষ্টি করে গেলেন আসার সম্ভাবনা। বিদায়ের

সুরে বাজিয়ে গেলেন আগমনীর তান। শ্রীরামকৃষ্ণের জড়দেহ ছেড়ে তাঁর নব জন্ম শুরু হল বিবেকানন্দের মধ্যে।

সন্ধান ও সাধনা

১৮৮৬ সালের ১৭ আগষ্ট পরমহংসদেবের মহাপ্রস্থানের পর তরুণ শিষ্যেরা অনেকেই আর বাড়ী ফিরলেন না। যাঁরা বা ফিরলেন বেশিদিন বাড়ীতে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল না। গুরুর কৃপায় তাঁরা সকলেই সাধন জীবনের কিছু না কিছু অনুভূতি পেয়েছিলেন। তাই সংসারীদের সংসর্গে শীঘ্রই তাঁদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শেষে গৃহীভক্ত শ্রীযুক্ত বলরাম বসু বললেন, আমি ঠাকুরের খরচের জন্যে তো কিছু কিছু দিতুম। তোমাদের জন্যেও তাই দেব। তোমরা একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে এক সঙ্গে থেকে সাধন ভজন কর। মাঝে মাঝে এসে আমরাও সৎ-আলোচনায় মনটা জুড়িয়ে যেতে পারব।

বলরামবাবুর সাহায্যে বরাহনগরে একখানা বাড়ী নিয়ে তরুণ শিষ্যেরা এক সঙ্গে রইলেন—নরেন্দ্র হলেন তাঁদের পরিচালক। বরাহনগরের এই মঠেই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ মিশনের সূত্রপাত হয়। নরেন্দ্র কোন গুরু-

ভাইকে নিছক ভাবাবেগের পথে সাধনা করতে দিতেন না। তিনি ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় পৃথিবীর নানাধর্ম সম্বন্ধে নানা বই সকলকে পড়ে শোনাতেন, তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা করতেন। সারাদিন সাধন ভজন তো ছিলই। দিনরাত্রি তাঁদের এক চিন্তা—যেমন করেই হোক গুরুর নির্দিষ্ট পথে সিদ্ধিলাভ করতেই হবে। পরমহংসদেবের অসুখের সময়ে যেমন ভাবে তাঁদের তপস্যা করে দিন কাটত, তাঁর অবর্তমানে তাঁদের সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্রতর হয়ে জেগে উঠেছিল। খুব ভোরে উঠে দুপুর পর্যন্ত চলত ধ্যান। তারপর সামান্য কিছু দিয়ে ভাত খেয়ে পড়া-আলোচনা হত। কোন কোন দিন আবার পয়সার অভাবে রান্নাই হত না। উপোস করেই পড়ার কাজ চালাতেন তাঁরা। তারপর মাঝ রাত পর্যন্ত কাটত ধ্যানে। সংসারের সমস্ত মধুর আশা তাঁদের ঘুচে গেছল। গুরুর কাছ থেকে প্রত্যেকে পেয়েছিলেন অমৃতের ক্ষণিক আস্বাদ। আজ তাঁরা সেই অমৃতের উৎসসন্ধানী।

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি গুণ খুব প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাঁর হৃদয়ে অবশ্য ছিল অদ্বৈত তত্ত্বের চরম উপলব্ধির জন্যে অসীম ব্যাকুলতা। পূর্ণ বৈরাগী তিনি। কিছুদিন আগেও যে মা ভাই বোনদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না—আজ

তাঁদের কথা পর্যন্ত ভুলতে বসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, গুরুভাইদের ওপর তাঁর মমতার শেষ নেই। একদিন কোন মহারাজ মঠের কারোকে না বলে তীর্থভ্রমণে পালিয়ে যান। নরেন্দ্র তখন মঠে ছিলেন না। এসে সে কথা শুনে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। সহরের আশে পাশে খোঁজাখুজি করার জন্যে এক একজনকে এক একদিকে পাঠিয়ে দিলেন। নিজেও বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে থেকে তাঁকে যতই কঠোর দেখাক না কেন বিবেকানন্দের হৃদয় ছিল জুঁই ফুলের পাপড়ির মত। মানুষের ওপর অপরিসীম ভালবাসা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। জীবনের যে অবস্থাতেই হোক, যাঁরা তাঁর কাছাকাছি এসেছেন তাঁদের আকর্ষণ কোনদিন তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর জটিল চরিত্রে নানা বিপরীতের সমাবেশ আশ্চর্যভাবে দেখা যায়। তাঁর মধ্যে ছিল একই সঙ্গে সংসারের ওপর তীব্র নিরাসক্তি এবং মানুষের ওপর সুগভীর প্রেম। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষের চেয়েও প্রিয় বিশ্বপ্রকৃতি। মানুষের সেবায় গান্ধীজি জীবন উৎসর্গ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর কাছে তাঁর ধর্মের চেয়ে মানুষ বড় নয়। অহিংস তত্ত্বের সাফল্যের আশায় মানুষকে বিসর্জন দিতে জীবনে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু বিবেকানন্দ মানুষের সেবায় তাঁর বহু সাধের মুক্তিসাধনা পর্যন্ত দান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥"

তাঁর চিত্তে একদিকে ছিল গভীর কল্পনাপ্রবণতা আর একদিকে তীক্ষ্ণ বাস্তবপ্রিয়তা। প্রত্যক্ষজ্ঞান না হলে তিনি কোন জিনিসকে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। মানুষকে তিনি দূর থেকে নিবিড় কল্পনার সাহায্যে দেখেন নি। দূর থেকে দেখলে মানুষের জন্যে তাঁর হৃদয় এমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে পারত না। পৃথিবীতে জন্মেছিলেন তিনি দুর্গত মনুষ্যত্বের সেবার জন্যে। আশ্চর্য এই যে, পরিব্রাজক জীবনের আগে পর্যন্ত সেই মানুষ-গোষ্ঠীর দিকে তাঁর চোখ পড়ে নি। বরং এর আগে ভবিষ্যৎ জীবনের জীবসেবার বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে বারবার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি আন্তরিক অসম্মতিই জানিয়ে এসেছেন। জীবসেবা তাঁর জীবনের লক্ষ্য নয়—তিনি চান সাধক-জীবনের চরম সিদ্ধি। কিন্তু পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতার মধ্যে দিয়ে যেদিন তাঁর বস্তুপন্থী মনের সঙ্গে ভারতবর্ষের পঙ্গু, নির্বীর্য, নিপীড়িত মানুষদলের পরিচয় ঘটল সেদিন তাঁর সাধনার চরম সিদ্ধির স্বপ্ন নিমেষে মিলিয়ে গেছল। মানুষের চিরসখা নিজেকে আর সংবরণ করে রাখতে পারেন নি। তাঁর হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠেছিল নতুন রাগিনী—মনুষ্যত্বের জয়গানে তা ভরপুর। দূরের

দেবতাকে পাবার আশায় তিনি কাছের মানুষকে ত্যাগ করেন নি। মানুষের বুকে তিনি স্বর্গের দেবতার সন্ধান পেয়েছিলেন।

অবশ্য বরাহনগর মঠে থাকার সময় এই সেবাব্রতের সন্ধান তাঁর মধ্যে তখনো জাগে নি। অন্যান্য গুরু-ভাইদের মত তখনো তিনি সাধনা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কাশীর শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্র প্রভৃতিকে লেখা চিঠি থেকে দেখা যায়, এই সময় থেকে ব্যক্তিগত সাধনাকে তিনি একটা বৃহত্তর ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। যে অদ্বৈত তত্ত্বের সাধক তিনি, সেই তত্ত্ব ভারতের বিরাট যজ্ঞশালায় যুগের পর যুগ ধরে নানা ধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেভাবে বিকশিত ও ভারতীয় সভ্যতাকে কেন্দ্র করে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে তার আলোচনায় বিবেকানন্দের মন ব্যাপৃত ছিল। আলোচনা করতে করতে ক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষ একটা জীবন্ত শক্তিরূপে তাঁর হৃদয়ে জেগে ওঠে। কল্পনায় তিনি দেখতে পান এক বিশাল জাতির আত্মপ্রকাশের জয়-যাত্রা। ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে আজো পড়ে আছে সেই দুর্জয় যাত্রার পদচিহ্ন। নরেন্দ্রনাথ কল্পনার সাহায্যে হৃদয়ে যা পেয়েছিলেন, বাইরে তার বাস্তব রূপের সন্ধান করবার জন্যে ক্রমে আকুল হয়ে পড়লেন। গত বছর দুই বরাহনগর মঠে কেটে গেছল কিন্তু আর সেখানে

থাকা সম্ভব নয়। সুদূরের ডাক ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠছে। শেষে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মঠ ছেড়ে বার হলেন তীর্থ ভ্রমণে। একে একে কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন দেখা শেষ করলেন। বৃন্দাবন থেকে বার হয়ে হিমালয় যাবার পথে হাতরাশ ষ্টেশনে এসে হাজির হলেন। তখন দুপুর বেলা। নরেন্দ্র ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। পথশ্রমের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। ষ্টেশনের এক পাশে চুপ করে বসে বসে ভাবছেন এমন সময় ষ্টেশনের তরুণ সহকারী কর্মচারী শ্রীযুক্ত শরৎ গুপ্ত তাঁকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। তীর্থগামী, ক্ষুধায় কাতর সাধুসন্ন্যাসী প্রায়ই এমনি ধারা চুপ করে বসে থাকেন। রেলপথের চাকরি করতে করতে এ দৃশ্য তিনি আজ নতুন দেখছেন না—তবু যেন মনে হয়, এই প্রতিভা-দীপ্ত সন্ন্যাসী ভীড়ের মানুষ নন। এর বড় বড় চোখে কি অদ্ভুত জ্যোতি। মুগ্ধ শরৎচন্দ্র মজলেন। গদগদকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞসা করলেন, সাধুজি, আপনার কি খাওয়া হয়নি—খাবার আনব ?

সাধু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, নিয়ে এস।

দেখতে দেখতে শরৎচন্দ্রের বাসায় পরম আনন্দে ধর্মালোচনায় কয়েকদিন কেটে গেল। তাঁর ইচ্ছা, সাধুজি এমনি ভাবে আরো কিছুদিন কাটান। কিন্তু স্বামীজি সে উপরোধ রাখতে পারলেন না, বিদায়

চাইলেন। সন্ন্যাসীর এক জায়গায় বেশিদিন থাকা নিষিদ্ধ। তীর্থের পর তীর্থ পরিক্রমা বাকি রয়েছে। স্বামীজি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর পথের সাথী লম্বা লাঠিটি হাতে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তাঁর তরুণ অতিথি-সেবকও। সংসারে থাকা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্পর্শমণি তাঁর মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছে নব চেতনা। তিনি নরেন্দ্রনাথের শিষ্য হতে চান। স্বামীজি অনেক করে বোঝালেন কিন্তু মনের বাঁধন যাঁর টুটেছে সংসারের গতানুগতিক গার্হস্থ্যজীবন কি আর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে। এই তরুণ কর্মচারীই বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ।

সদানন্দ ছিলেন হাসিখুশি, শিল্পীপ্রকৃতির মানুষ। সংসারের যা কিছু সবই সুন্দর, সবই আনন্দের এই ছিল তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস। গুরু ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্যান। দুজনের মধ্যে অদ্ভুত ভালবাসার আকর্ষণ ছিল। বিবেকানন্দ বলতেন, সদানন্দ আমার মানস ছেলে। গুরুর মত অবশ্য শিষ্য প্রখর বুদ্ধিপ্রবণ ছিলেন না। তবু যে কয়জন কর্মযোগী বিবেকানন্দের নরনারায়ণের সেবাব্রতে সকলের আগে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন, সদানন্দ তাঁদের মধ্যে একজন। কুষ্ঠরোগীদের জন্যে তিনি সেবাশ্রম খুলেছিলেন।

ক্রমে গুরুশিষ্যে একসঙ্গে হৃষীকেশ দেখে ১৮৮৮

খৃষ্টাব্দের শেষদিকে বরাহনগর মঠে ফিরলেন। এই ভ্রমণের ফলে নরেন্দ্রের হৃদয়ে একটা নতুন বেদনা জেগে ওঠে। অদ্বৈত তত্ত্বের বিকাশভূমি বলে যে ভারতবর্ষের গৌরবমূর্তি কল্পনায় দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, সেই ভারতের আধুনিক বাস্তবমূর্তি দেখে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেছল। তিনি দেখেছিলেন, ভারতবর্ষে ধর্মলোপ পেয়েছে —মরা আচার, মিথ্যা ভণ্ডামির আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে একটা মহাজাতি ঘুমিয়ে আছে। প্রাণ নেই, কাঠামো নিয়ে তীর্থে তীর্থে ধর্মের ব্যবসা চলেছে। তার চেয়েও বেশি তাঁর বুকে বাজে হিন্দু সমাজের অধঃপতন। যে সমাজকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্ম বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল সেই সমাজ আজ মানুষকে ভুলেছে। মেয়েদের কোন স্বাধীনতা নেই, মানুষে মানুষে দুর্লঙ্ঘ্য ভেদ। একের প্রতি অপরের অবিচার। জাতিভেদ প্রথার শোচনীয় পরিণাম। ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা তিনি বইএ পড়েছিলেন,—মানুষের জন্মগত অধিকার যে মনুষ্যত্বের মর্যাদা, তা তারা অস্বীকার করেন নি। তাই তো তাঁদের সমাজের ভিৎ অত দুর্ভেদ্য। ভারতের গ্রামে গ্রামে নিপীড়িত মানুষের অপমানে নরেন্দ্রের অন্তর কাঁদতে থাকে।

কিন্তু তখনো ফুলের গন্ধ লুকিয়ে আছে কুঁড়ির মধ্যে। বিবেকানন্দ তখনো খুঁজে পান নি তাঁর জীবনব্রত। তখনো চলেছে তাঁর জীবনের সন্ধান যুগ।

কিছুদিন পরে তিনি আবার হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ। একে একে নৈনি-তাল, আলমোড়া, শ্রীনগর, টিহিরি, দেরাডুন, মীরাট দেখা শেষ হল। নরেন্দ্রের হৃদয়ের অশান্তি ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ তিনি স্থির করলেন, এবার একাই বেরিয়ে পড়বেন। গুরুভাইদের কারোকে সঙ্গে নেবেন না। তখন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। যাবার দিন তিনি সকলকে ডেকে বললেন, তোরা আমার খোঁজ করিস নি। আমি এবার একাই চললুম। এতদিনে আমার ব্রত খুঁজে পেয়েছি।

গুরুভাইদের নরেন্দ্র-অন্ত প্রাণ। এ কথা শুনে তাঁরা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁকে সব চেয়ে ভাল বাসতেন। তিনি বললেন, আমি সঙ্গে যাব। ছাড়ব না। নরেন্দ্র তার কথাও শুনলেন না। একলা বেরিয়ে পড়লেন।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন ভোর বেলা তিনি আলোয়ার রাজ্যে এসে হাজির হলেন। সামনে সরকারী হাঁস-পাতালে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই, এখানে সাধু সন্ন্যাসী থাকার জন্যে কোথাও একটু জায়গা মিলবে?

ডাঃ গুরুচরণ লস্কর দেশ ছেড়ে অনেক দিন প্রবাসী। হঠাৎ সন্ন্যাসীর মুখে বাংলা শুনে তিনি খুশি হয়ে তাঁকে

অভ্যর্থনা করলেন। কাছে বাজারের ওপর একখানা দোতলা বাড়ীতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি পরিচিত সকলকে খবর দিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে দু-একটি কথাবার্তা হতেই তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন। ইনি নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ,—এমনি তাঁর ধারণা। তাঁর বন্ধু মৌলভি সাহেব ছুটে এলেন। সন্ন্যাসীকে দেখেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন—শ্রদ্ধায় তাঁর মন ভরে উঠল। নরেন্দ্র তাঁকে কাছে বসালেন—ধর্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলতে লাগল। কথায় কথায় তিনি বললেন, কোরাণের বিশেষত্ব এই যে, আজ পর্যন্ত এর মধ্যে কেউ কলম চালাতে পারে নি। এগারো শো বছর আগে যেমন ছিল আজো তা ঠিক তেমনটিই আছে। পুরোতন বইএর এ রকম বিশুদ্ধতা রাখা দৈবাৎ দেখা যায়।

লোকের পর লোক এসে জমে। দিনের পর দিন ভীড় বাড়তে থাকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জন-স্রোত। এক একজনের এক এক ধরণের জিজ্ঞাসা। স্বামীজি হাসিমুখে সব কথার জবাব দিতেন। বুদ্ধ, শঙ্কর রামানুজ, চৈতন্য, তুলসীদাস—নানা মহাপুরুষের উপদেশ, হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান ধর্মের নানা মতামতের ব্যাখ্যা অনর্গল তিনি করে যেতেন। মাঝে মাঝে চলত হিন্দী ভজন, বাংলা কীর্তন,—কখন বা উর্দু গান। সব গানই তিনি গাইতেন আত্মভোলা হয়ে—গানের ভাব মূর্ত হয়ে

উঠত তাঁর অঙ্গের রেখায় রেখায়। চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ত।

স্বামীজির ওপর মৌলভি সাহেবের শ্রদ্ধার শেষ নেই। তাঁর ইচ্ছে হল, একদিন এঁকে নেমতন্ন করে নিজের বাড়ীতে খাওয়ান। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী মুসলমানের বাড়ীতে জলস্পর্শ যদি না করেন! একদিন বন্ধু গুরু-চরণকে বললেন, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে দিয়ে রান্না করিয়ে তাকে দিয়েই পরিবেশন করাব। ঘরের আসবাবপত্র সব ব্রাহ্মণকে দিয়ে ধুইয়ে স্বামীজিকে বসতে দেব। তোমাদের কোন আপত্তির কারণ থাকবে না। গুরুচরণের মুখে স্বামীজি সে কথা শুনেই রাজি হলেন। বললেন, অত কিছু করতে হবে না। তাঁর ধর্ম তো কোন সম্প্রদায় বিশেষের গণ্ডীবাঁধা আচার নয়,—বিশ্বমানবের ধর্ম তাঁর আদর্শ। মৌলভির দেখাদেখি আলোয়ার রাজ্যের আরো অনেক মুসলমান ভদ্রলোক স্বামীজিকে নেমতন্ন করে খাইয়েছিলেন।

ক্রমে আলোয়ার মহারাজের দেওয়ান মেজর রাম-চন্দ্রের কানে উঠল স্বামীজির কথা। তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়ে মহারাজকে বললেন। মহারাজ খুব ইউরোপীয় ভাবাপন্ন। তবু সাধুজি ইংরেজিতে খুব পণ্ডিত শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। প্রাথমিক শিষ্টাচারের পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজি, শুনলুম

আপনি খুব পণ্ডিত মানুষ। তাহলে আপনি তো সহজেই অনেক টাকা রোজগার করতে পারতেন। তা না করে এভাবে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছেন কেন ?

স্বামীজি জবাব দিলেন, মহারাজ, আপনি রাজ্যের কাজ না দেখে এমন করে সাহেবদের সঙ্গে রাতদিন শিকার করে ঘুরে বেড়ান কেন ?

মহারাজ অবাক হয়ে গেলেন। প্রশ্নটা তিনি করে-ছিলেন ফাঁকা মনে। মনে হল, জবাবটা কড়া বটে, তবু সত্যি। বললেন, কেন এমনি করে ঘুরে বেড়াই জানি না। বোধ হয় ভাল লাগে তাই করি।

—ঠিক বলেছেন। আমারো এমনি ফকিরী করে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। স্বামীজি মৃদু হেসে জবাব দিলেন।

মহারাজ একটু থেমে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মূর্তিপূজোয় বিশ্বাস করেন ? আমার ওতে মোটেই বিশ্বাস নেই। আমার দশা কি হবে ? মহারাজের মুখে বিদ্রূপের এক ফালি হাসি।

নরেন্দ্রনাথ প্রথমে মহারাজের মনের ভাব বুঝতে পারেন নি। বললেন, আপনি নিশ্চয়ই তামাসা করছেন।

—না স্বামীজি।—মহারাজ এবার গম্ভীর হয়ে বললেন : সত্যিই আমি ইঁট কাঠ মাটির মূর্তিকে দেবতা বলে পূজো করতে পারি না।

—যাঁর যেমন বিশ্বাস। এই বলে স্বামীজি চুপ করে রইলেন। সকলেই ভাবলে, সাধুজি কথাটাকে এড়িয়ে গেলেন।

—এ ছবিটা কার? হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ দেওয়ালে-টাঙানো একখানা ছবি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

দেওয়ানজি জবাব দিলেন, মহারাজের ছবি।

স্বামীজি গম্ভীর স্বরে হুকুম করলেন, দেওয়ানজি, এই ছবির ওপরে থুথু ফেলুন।

সকলে অবাক হয়ে গেল। এ কি কথা! সাধুজির এত বড় স্পর্দ্ধা! দেওয়ানজিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বামীজি ফের বললেন, আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে যে কেউ এই ছবিখানার ওপর থুথু ফেলুন।—আপত্তি কিসের? এতো সামান্য একটুকরো কাগজমাত্র।

কারো মুখে কথা নেই। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। সকলেই বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, স্বামীজির মত মহাপুরুষ এ কি হুকুম দিচ্ছেন!

শেষে দেওয়ানজি কথা বললেন, স্বামীজি, আপনি একি হুকুম করছেন,—এ যে আমাদের মহারাজের ছবি। মহারাজকে অসম্মান করব কেমন করে?

—মহারাজ তো আর সশরীরে ছবির মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই। একটুকরো কাগজের ওপর থুথু ফেলতে আপনাদের সঙ্কোচ কেন? একটু থেমে স্বামীজি সকলের দিকে ফিরে

বলতে লাগলেন, জানি, সঙ্কোচ হবেই। কেন না, এই ফটোখানার মধ্যে মহারাজের ছায়া আছে। তাতে থুথু ফেললে মনে হবে যেন মহারাজের গায়ের ওপরেই থুথু ফেলা হল।

জবাব শুনে উপস্থিত সকলে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। তখন স্বামীজি মহারাজের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, দেখুন মহারাজ, এই ছবি আপনি নন তবু এর মধ্যে আপনার ছায়া আছে বলে লোকে একে আপনার মতই সম্মান করে। তেমনি মাটির তৈরি দেবদেবীকে কেউ মাটি বলে উপাসনা করে না—মাটির মধ্যে ভগবানের কোন ভাবের কল্পনা করে পূজো করে। মূর্তি জাগিয়ে তোলে আরাধ্য দেবতার স্মৃতি। —তাঁর কোন বিশেষ গুণকে স্মরণ করিয়ে মনে ভাব উদ্দীপন করে। আমি অনেক জায়গায় বেড়িয়েছি। কিন্তু কোথাও দেখিনি মূর্তিপূজো করতে করতে কেউ বলছে, হে পাথর, হে মাটি, তোমায় নমস্কার করি, আমাকে বর দাও। মহারাজ, মৃন্ময় মূর্তিকে উপলক্ষ্য করে সকলেই চিন্ময়ের ধ্যান করে।

মহারাজ মঙ্গল সিং স্বামীজির কথাবার্তায় বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি দেওয়ানকে বললেন, যেমন করেই হোক, এই মহাপুরুষকে আমাদের দেশে কিছুদিনের জন্য ধরে রাখুন। তাঁর মত লোক আর কখনো দেখিনি।

দেওয়ানজি নরেন্দ্রের কাছে এসে সবিনয়ে বললেন, কিছুদিন আমার বাড়ীতে আপনি যদি থাকেন তাহলে কৃতার্থ হব। স্বামীজি রাজি হলেন এক সর্তে। গরীব, দুঃখী, ইতর - সাধারণ যেন যখন খুশি তাঁর কাছে আসতে পারে।

মার্চের শেষে আলোয়াড় থেকে বেরিয়ে তিনি সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে জয়পুর, আজমীড়, খেতড়ি, আমেদাবাদ, কাথিওয়াড় বেড়ান শেষ করেন। আবু পাহাড়ে এসে তখন তিনি লোকালয় থেকে দূরে একটি গুহার মধ্যে একাকী সাধনভজনে দিন কাটাচ্ছিলেন। একদিন এক মুসলমান আইনজীবী তাঁকে দেখতে পেলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর তিনি সাধুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে শ্রদ্ধানত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনার কোন কাজ করে দিতে পারলে খুশি হব। বলুন কি করতে হবে?

ঘরছাড়া সন্নাসী জবাব দিলেন, কিছুরই তো এখন দরকার নেই।

—না, ওরকম ফাঁকা কথায় আমি ভুলব না। ভদ্রলোক আগ্রহের সঙ্গে বললেন।

স্বামীজি তাঁর আগ্রহ দেখে বললেন, দেখুন, বর্ষা আসছে। আমার এই গুহার দরজা নেই। আপনি একটা দরজা করিয়ে দেবেন, তাহলে।

—সাধুজি, এই গুহাটা বিশ্রী। আমার বাংলোয় আমি

একলা থাকি। আপনি আসুন, সেখানে থাকবেন। আপনার সাধন-ভজনের কোন অসুবিধা হবে না। এই মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতেই খেতড়ি-রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সী জগমোহন লালের সঙ্গে স্বামীজির আলাপ হয়। তাঁর আগ্রহে নরেন্দ্রনাথ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন। কিন্তু শ্রীযুক্ত জগমোহনের মুখে সন্ন্যাসীর অলৌকিক গুণের কথা শুনে মহারাজ দেরী সহ্য করতে পারেন নি। তিনি নিজেই দেখা করবার জন্যে উদ্যত হলেন। সে কথা স্বামীজির কানে যেতে শেষে তিনিই এসে দেখা করলেন।

মহারাজ তাঁকে কয়েকটি চমৎকার প্রশ্ন করেছিলেন। একটি প্রশ্ন হচ্ছে, জীবনটা কি ?

ঝটিতি জবাব এসেছিল, নিয়ত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের চেষ্টার নাম জীবন।

স্বামীজির মুখে আর আর প্রশ্নের উত্তর শুনে মহারাজ অবাক হয়ে যান,—এমন নতুন ভাবে পুরোতন জিনিসের ব্যাখ্যা আর কখনো তিনি শোনেন নি। তাঁর মনে হয়, এতদিন পরে তিনি এমন এক পুরুষসিংহের দেখা পেয়েছেন, যাঁর শক্তির তুলনা নেই, যিনি জন্মেছেন মানুষের রাজা হয়ে। সেই রাজার চরণে মহারাজ নিজেকে সঁপে দিলেন। আবুপাহাড় থেকে দেশে ফিরে যাবার সময়

শিষ্যের বিশেষ পীড়াপীড়িতে বিবেকানন্দকে তাঁর সঙ্গে যেতে হল। খেতড়ি পৌঁছবার কিছুদিন পরে মহারাজ তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। তাঁর গুরুভক্তির সীমা ছিল না। মাঝ রাতে স্বামীজি ঘুমুলে তিনি গুরুর পদসেবা করতেন। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে স্বামীজি তা জানতে পারেন। তিনি রাগ করলেন। কিন্তু শিষ্য কিছুতেই ছাড়বেন না। তিনি মিনতি করে বলতে লাগলেন, আমি আপনার শিষ্য, আমাকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।

স্বামীজি যেখানেই যেতেন ধর্ম সাধনায় মানুষকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন, মতামতের তর্কবিচারের মধ্যে ধর্ম নেই। ধর্ম অনুভূতির জিনিস। তা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ কর। ধর্মপথে জানাটা বড় কথা নয়—হওয়াই মানুষের যথার্থ আদর্শ। তিনি সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। তিনি দেখেছিলেন, ভারতবর্ষে ধর্মলোপ পেতে বসেছে। তার চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার, যে সমাজ সেই ধর্মের বাহন তা আজ অধঃপতনের শেষ স্তরে। প্রথমে সেই সমাজকে তুলতে হবে, তার মধ্যে আনতে হবে প্রাণের প্রবাহ। সমাজের যাঁরা পরিচালক, সেই ইংরেজি শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর কাছে তিনি তাঁর নতুন বাণী প্রচার করতেন। সকলকে তিনি প্রাচীন ভারতের মহাঅতীতের

কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। যুবকদের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ জাগাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সকলে সবচেয়ে মুগ্ধ হত একটি বিষয়ে, তা হচ্ছে এই যে, বেদান্তের ধর্মকে তিনি নতুন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাঁর কাছে উপনিষদের ধর্ম নিছক তত্ত্ব ছিল না—তাদের সাকার জীবন্ত মূর্তি তিনি দেখেছিলেন এক মহাজাতির মধ্যে। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতের এক অখণ্ড মূর্তি তাঁর উদ্ভাসিত চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। যতই তিনি এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে পরিক্রম করছিলেন,—একদেশ থেকে আর এক দেশে যতই তিনি অর্দ্ধাহারী, কৌপীনধারী, দীর্ঘদিন সমাজের অবহেলায় পঙ্গু গরীব ভারতবাসীর সংস্পর্শে আসছিলেন, ততই সেই অখণ্ড ভারতবর্ষের মূর্তি তাঁর কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ শুধু দেশে দেশে বাণী প্রচার আর তীর্থে তীর্থে সাধন ভজন করেই বেড়াতেন না—চিরকাল জ্ঞানের স্পৃহা তাঁর অদম্য। যেখানে যতটুকু সুবিধা পেতেন ভারতের জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শিখ, পার্শী প্রভৃতি নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মতামত এবং পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান পড়তেন,—বিশেষভাবে নিজের সংস্কৃত বিদ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতেন। জয়পুরে এক বিখ্যাত

বৈয়াকরণের কাছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়তে শুরু করেন। পণ্ডিতজি শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন বটে কিন্তু বোঝাতে ভাল পারতেন না। তাঁর কাছে ক্রমান্বয়ে তিন দিন ধরে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা শুনেও স্বামীজি তা পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারলেন না। চতুর্থদিন পণ্ডিতজি বললেন, স্বামীজি আমায় মাপ করবেন, আমি আপনাকে পড়াতে পারব না। তাঁর কথার মধ্যে স্বামীজির বুদ্ধি-হীনতার ইঙ্গিত ছিল। স্বামীজি বিশেষ লজ্জা পেলেন। ইচ্ছাশক্তি তাঁর চিরদিন অনন্যসাধারণ। তিনি পণ করলেন, যেমন করেই হোক, নিজের চেষ্টায় ভাষ্যের মানে বুঝবেন। এই সংকল্প নিয়ে নির্জনে বারবার পড়তে লাগলেন। ক্রমে দুর্বোধের অর্থ স্পষ্ট হয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিতজির কাছে এসে ব্যাখ্যা শোনালেন। পণ্ডিতজি তো একেবারে স্তম্ভিত। তারপর থেকে ছাত্র সূত্রের পর সূত্র অনায়াসেই আয়ত্ত করেছিলেন। খেতড়িতেও এক মহাপণ্ডিতের কাছে স্বামীজি পতঞ্জলির মহাভাষ্য পড়েন।

কিন্তু বই-পড়া বিদ্যার চেয়েও অভিজ্ঞতায় পাওয়া জ্ঞানে দিন দিন তাঁর মন ভরে উঠছিল। জীবন সমুদ্রের তীরে ছড়িয়ে আছে কত পাথর নুড়ি, কত মণিরত্ন। তাঁর হৃদয়দেবতা সংগ্রহ করছিলেন সেই অমূল্য মণিরত্ন। তাদের স্পর্শে তাঁর অন্তরের সব মলামাটি—সব সংকীর্ণ

সংস্কার দূর হয়ে যাচ্ছিল। জন্মেছিলেন তিনি সমাজের উঁচু ঘরে,—মানুষ হয়েছিলেন আভিজাত্যের পরিমণ্ডলে। জীবনের নীচের তলার অন্ধকারে লুকানো অনেক কিছুই এতদিন তাঁর চোখে পড়ে নি। সমাজের উঁচু শ্রেণীর নীতিবাগীশদের শেখানো নীতি দিয়েই তাঁর মনে ভাল মন্দ বোধের মাপকাঠি তৈরি হয়েছিল। আজ জীবন-দেবতা তাঁকে নিয়ে এসে হাজির করেছিলেন সমাজের সেই কোণে যেখানে ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে আবর্জনা। তিনি আবর্জনায় নেমে দেখতে পেয়েছিলেন পদ্মের সন্ধান। পরিব্রাজক অবস্থায় চোর, ডাকাত, মুচি, মেথর, গরীব, মূর্খ নানালোকের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তাদের কারো কারো মধ্যে দেখেছিলেন অদ্ভুত ধর্মভাবের স্ফুরণ,—কেউ কেউ মহত্ত্বে অতুলনীয়। ক্লান্ত, নিঃসম্বল, ক্ষুধার্ত স্বামীজিকে কতবার তারা খাবার দিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে। একবার আলমোড়ার কিছু আগে তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন। কয়েকদিন শুধু জল ছাড়া আর কিছু তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। সাথী অখণ্ডানন্দেরও সেই অবস্থা। তিনি নিরুপায় হয়ে জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন,—যেমন করে হোক স্বামীজিকে বাঁচাতে হবেই। স্বামীজি নির্জনে পথের ধারে একা পড়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে এক মুসলমান ফকির সেইখান দিয়ে যেতে যেতে তাঁকে দেখতে পেলেন। কিছুদূরে

একটি গোরস্থান ছিল, লোকটি তার রক্ষক। স্বামীজির অবস্থা দেখে দৌড়ে বাসায় গিয়ে একটি শশা নিয়ে এলেন। গরীবের ঘরে দেবার মত আর কিছু ছিল না। শশা খেয়ে স্বামীজি কিছু সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে পরে বলতেন, লোকটি সত্যিই সেদিন আমার জীবনদান করেছিল। ক্ষিধের জ্বালায় এত কষ্ট আর কখনো আমার হয় নি।

কয়েক বছর পরে আর একদিন সেই গরীব ফকিরের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ দেখা হয়েছিল। তখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ। আলমোড়ায় এসেছেন। লোকে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে বিপুল সমারোহে আয়োজন করেছে। বিরাট সভা,—চারিদিকে লোকের স্রোত। হঠাৎ স্বামীজি দেখতে পেলেন, দূরে সেই ফকির জনতার মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর নির্দেশে ফকিরকে সসম্মানে নিয়ে আসা হল। তিনি তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে তাঁর ভক্তেরা ফকিরকে কিছু টাকাকড়ি দান করেছিলেন।

একবার এক জায়গায় লোকেদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতে করতে তাঁর দুদিন কেটে গেল। কত লোক আসে, যায়, কিন্তু কেউ তাঁকে খাবার কথা জিজ্ঞাসা করে না। স্বামীজিও কারোর কাছে চান না। তৃতীয় দিন রাত্তিরে

অপর সকলে চলে গেলে এক মুচি চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে বললে, মহারাজ আপনার তো মোটেই খাওয়া হয় নি।

স্বামীজি বললেন, কিছু খাবার এনে দিতে পারিস ?

সে বললে, আমার হাতের তৈরি রুটি যে আপনাকে খেতে নেই হুজুর। আমি যে জাতে মুচি। বরং সব এনে দিচ্ছি, আপনি আটা মেখে রুটি বানিয়ে নিন।

স্বামীজির উদার হৃদয়—এত বড় মহত্ত্ব দেখে তিনি কেমন করে চুপ করে থাকবেন। আবেগে তাঁর মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললেন, তোর হাতেই খাব। রুটি নিয়ে আয়।

লোকটি কিন্তু কিছুতেই দেবে না। খেতড়ির মহারাজের প্রজা সে। মহারাজের কানে এ কথা উঠলে তার আর শাস্তির শেষ থাকবে না। ভয়ে ভয়ে সে জানালে না মহারাজ, আমি তা পারব না। শেষে স্বামীজির পীড়াপীড়িতে শাস্তির ভয় অগ্রাহ্য করে সে খাবার এনেছিল। বলা বেশির ভাগ, খেতড়ির রাজা পরে এ কথা জানতে পেরে তাকে অনেক টাকা কড়ি জমি জায়গা দিয়েছিলেন।

খেতড়িতে আর একটি সুন্দর ঘটনা ঘটে ছিল। মহারাজ একদিন বাগান বাড়ীতে বিশ্রাম করছেন, কয়েকজন বাইজী দূর থেকে এসেছিল—তারা গান ধরেছে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল স্বামীজিকে সভায় নিয়ে এসে গান শোনাবেন—কদিন থেকে তাঁর মন ভাল যাচ্ছে না।

স্বামীজি এসে আসরে বসতেই একজন গান শুরু করলে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি উঠে পড়লেন,—স্ত্রীলোকের গান শোনা সন্ন্যাসীর উচিত নয়। তাছাড়া, তাঁর ধারণা ছিল, এ রকমের মেয়ে-গাইয়েরা সাধারণত অতি হীন। মহারাজ বার বার বলতে লাগলেন, এ চমৎকার গায়। আপনি এর গান শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন। অন্তত একখানা গান শুনে যান—বসুন। শেষে স্বামীজি বসলেন।

অন্ধকার রাত। চারিদিক চুপচাপ। গায়িকার কণ্ঠে স্তরে স্তরে সুর উঠতে নামতে থাকে। মনপ্রাণ সমর্পণ করে সে গাইছে ভক্ত সুরদাসের পদ : প্রভু, আমি গুণহীন, আমার পাপের কথা ভেবে আমাকে ঠেল না। তোমার নাম যে সমদর্শী। যে লোহা দিয়ে দেবতার মূর্তি গড়া হয়, সেই লোহা দিয়েই তৈরি হয় ব্যাধের তীর। কিন্তু স্পর্শমণির স্পর্শে দুই-ই সোনা হয়ে যায়।

নদীর জল আর ময়লা নালার জলে কত না তফাৎ। কিন্তু যখন গঙ্গায় এসে মেশে তখন দুই হয়ে ওঠে পবিত্র।

মায়া আর ব্রহ্ম একই। অজ্ঞানীর কাছে তারা আলাদা, জ্ঞানীর চোখে ভেদাভেদ নেই। *

* "প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,

গানশুনে স্বামীজির চোখ দুটি বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে এল। সংস্কারের জড় যে মন থেকে মুছেও মুছতে চায় না। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তাঁর না বিশ্বাস ছিল, মানুষে মানুষে সবাই সমান! পতিতা নারীর ওপর সংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসীর একি অকারণ ঘৃণা! বাইরেটাই তো মানুষের সব নয়। অন্তরের পরিচয়েই তার সত্যিকার পরিচয়। অকারণ মনুষ্যত্বের অপমান যে করে তার মত মনুষ্যত্বহীন আর কে আছে। মনে মনে তিনি নিজের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

কাথিওয়ার থেকে আরো বছর দেড়েক কাটল জুনাগড়, গুজরাত, পোরবন্দর, দ্বারকা, বরোদা, খাণ্ডোয়া, বোম্বে, পুনা, বেলগাঁয়ে।

পোরবন্দরে এক পণ্ডিতের কাছে ফরাসী ভাষা শেখেন। সেই পণ্ডিত কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলেন, আপনি যে সব মতবাদের কথা বলছেন, এদেশে কে তার আদর করবে!

এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়,
দুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী, এক লহর, বহত মিলি নীর ভরো,
যব মিলিহে তব এক বরণ হোয় গঙ্গা নাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।'

আপনি ইউরোপে যান, সেখানে আপনার বাণী প্রচার করুন। মানুষ আপনার কদর বুঝবে। সনাতন ধর্মের সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা নতুন আলো পাবেন। স্বামীজি বিশেষ কোন জবাব দেন নি। কিন্তু কথাগুলো তাঁর মনে লেগেছিল। খাণ্ডোয়ায় তিনি তাঁর গোপন ইচ্ছা প্রথম প্রকাশ করেন। জুনাগড় বা পোরবন্দরে তিনি শুনে এসেছিলেন, চিকাগো সহরে ধর্মমহাসম্মেলন হবে। এখানে তিনি ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে বলেন, কেউ জাহাজ ভাড়া দিলে আমি ধর্ম সম্মেলনে যেতে পারি। কিন্তু তখনো এ ইচ্ছা ছিল মনের মধ্যে একটা বুদবুদের মত। কারণ কিছুদিন পরে তাঁর মুখে এই কথা শুনে বেলগাঁয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র যখন সাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলবেন স্থির করেন তখন স্বামীজি তাঁকে বারণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে তখনো দ্বন্দ্বের শেষ হয় নি। এক অদৃশ্য মহাশক্তি তাঁকে আপন উদ্দেশ্যমত ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে। তিনি তাঁর অন্তরের সহস্র দ্বন্দ্ব নিয়ে সেই মহাশক্তির প্রবাহে আপনাকে সমর্পণ করেছেন। ঘর ছেড়েছেন, আত্মীয় বন্ধু গুরু ভাইদের ভুলেছেন। সংসারের সব ভোগের আশা ত্যাগ করেছেন। নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়, নিরাত্মীয় তিনি তো আর তাঁর নিজের নন। তিনি যে নিবেদিত। সেই শক্তির কৃপায় সব ছেড়ে তিনি সব পেয়েছেন। দেশে দেশে তাঁর পরমাত্মীয়—ঘরে ঘরে তাঁর

ঠাঁই। আমেরিকা যাওয়া সম্বন্ধে সেই শক্তির কাছ থেকে তিনি আজ আদেশ চান—নিজের সম্বন্ধে নিজে ভাবা তিনি যে অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছেন।

ক্রমে মহীশূর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, রামেশ্বর দেখা শেষ করে কুমারিকা অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হৃদয়ে তাঁর সেই বেদান্তভূমি ভারতের চিন্তা। আগে তিনি ভাবতেন, এই পুণ্যভূমিতে আবার আধ্যাত্মিকতা কেমন করে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তার সঙ্গে অবশ্য ছিল সমাজ সংস্কার ও গরীব পতিত পদদলিতের চিন্তা। এখন সেই চিন্তার গতি বদলে গেছে। আজ তিনি ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। আজকের ভারতবর্ষে মনুষ্যত্বের অশেষ দুর্গতি। তিনি বুকের রক্ত দিয়ে তা বুঝেছেন—তাঁদের নিদারুণ দুঃখ সহ্য করতে না পেরে চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়েছে। তাই আজ তাঁর কেবল ভাবনা, কেমন করে এদের মধ্যে প্রাণ জাগানো যায়—এদের মুখে দুমুঠো অন্ন, এদের মনে একটুকরো আশার আলো কেমন করে জ্বালাবেন! এই অসাড়, ঘুমিয়ে-পড়া জনস্তূপ নিয়ে কেমন করে গড়া যায় নতুন মানুষ! মা কুমারীর মন্দিরে ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকুর ওপর বসে বসে তিনি সেই চিন্তা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর রেখাবহুল ললাট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—বিদ্যুৎ গতিতে খেলে গেল একটা

মতলব। তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনব্রত। তাঁর মনে হল, তাঁরা যে এত জন সন্ন্যাসী ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দেশে দর্শন প্রচার করছেন,—এ সব পাগলামি। খালিপেটে ধর্ম হয় না। তাঁর গুরুদেব বলতেন। এই যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন কাটাচ্ছে, এর কারণ মূর্খতা। যদি কতকগুলো নিঃস্বার্থ, পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক হাতে আচণ্ডালের মধ্যে বিদ্যাবিতরণ করে বেড়ান, যদি তাঁরা তাদের রোগে দুর্দিনে তাদের পাশে বসে সেবা করেন,—তাদের মনে মনুষ্যত্বের গৌরব জাগিয়ে তোলেন, তাহলে ভারতভাগ্য-বিধাতা আবার জেগে উঠবেন। এ ব্রতে চাই কর্মী, চাই পয়সা। ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে তিনি দেখেছেন লোক জোগাড় করার শক্তি তাঁর আছে। এখান থেকেই কাজের উপযোগী কর্মী তিনি পাবেন কিন্তু টাকা? ভারতের মধ্যবিত্ত জনসাধারণ নিতান্ত গরীব। তারা দিন আনে দিন খায়। তারা বুকের রক্ত দিতে পারে কিন্তু অর্থ পাবে কোথায়! আর ধনীরা? তারা অনেকেই গোঁড়া, কল্পনাহীন, সংকীর্ণ বুদ্ধি। নানা বাজে কাজে পয়সা খরচ করে কিন্তু মানুষের সেবায় পয়সা দিতে তারা শেখে নি। বিবেকানন্দের মনে পড়ল, আমেরিকার ধর্মমহাসম্মেলনের কথা। আমেরিকা ইউরোপে গিয়ে তিনি চেষ্টা করে দেখবেন, যদি পয়সা পাওয়া যায়। তাছাড়া, তিনি তো দু-একটি গ্রাম নিয়ে কাজ করতে

চান না, তাঁর যে বিরাট পরিকল্পনা। বিশাল দেশের এক একটি জনপদ অতিক্রম করে প্রচার করলে তো জীবনে সে পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা যাবে না। কিন্তু যদি পাশ্চাত্যে গিয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, তাহলে অতি অনায়াসে এক আঘাতে হিন্দুজাতির কেন্দ্রমূলে কম্পন জাগাতে পারবেন। তাঁর পাঞ্চজন্যের রবে স্তূপাকার কুসংস্কারের প্রাচীন ভিৎ এক নিমেষে ভেঙে যাবে। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রার অবসান হবে। মানুষের নারায়ণ জেগে উঠবেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি এসে পৌঁছলেন মান্দ্রাজে। হৃদয়ে তাঁর পুঞ্জীভূত শক্তির বিপুল মাদন, স্বদেশপ্রেমের তীব্র ব্যাকুলতা আর জীবনব্রত খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। দলে দলে লোক এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। মান্দ্রাজ সহরেই প্রথম তিনি খোলাখুলিভাবে সাধারণ্যে নিজেকে প্রকাশ করলেন। প্রতিভাসম্পন্ন যুবকেরা এসে তাঁকে অনুসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল। তিনি তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর বুকের বেদনা। মুদালীয়ার, সুব্রাহ্মণ্য আয়ার, পেরুমল প্রভৃতি মান্দ্রাজী যুবকেরা স্বদেশের নবজাগরণযজ্ঞে নিজেদের সঁপে দিলেন। মান্দ্রাজ সহর ভরে উঠল স্বামীজির জয়গানে। হায়দরাবাদে গিয়ে পৌঁছল তার রেশ। সেখান থেকে নিমন্ত্রণ এল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের

ফেব্রুয়ারী মাসে হায়দরাবাদেই তিনি প্রথম সাধারণের কাছে তাঁর আমেরিকা যাবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন মহবুব কলেজে 'মাই মিশন টু দি ওয়েষ্ট' বক্তৃতা প্রসঙ্গে। সেখানকার ধনী মহাজনেরা তাঁর বিদেশ যাবার সব কিছু খরচ দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা নিতে রাজি হলেন না। তখনো তাঁর অন্তরে বিদেশ যাওয়া সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় নি। তাঁর মধ্যে মুক্তিকামী সাধকের সঙ্গে মানুষের দুঃখে পীড়িত কর্মযোগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখনো চলেছে। অনাগত দিনে কোন্ রূপে তিনি নিজের বিকাশকে পরিপূর্ণ করে তুলবেন, এ জিজ্ঞাসার যেন কিছুতেই মীমাংসা হচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সঙ্গে দেখা হবার প্রথম দিকে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল অদ্বৈততত্ত্বের বিরুদ্ধে। আজ সেই অদ্বৈত অনুভূতির ব্যাকুলতাই তাঁর কর্মযোগের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এই দ্বন্দ্বের দোটানা আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি বলেই তিনি এতদিন বারবার আমেরিকা যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেও তাঁর জলযাত্রার সাহায্যকল্পে চাঁদা তোলায় কিছুতেই সম্মতি দিতে পারছিলেন না। এই দ্বন্দ্ব চরিত্রের একটি মূল দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেকানন্দের জীবনে বরাবর দেখা যায়। তাঁর সমকালিক রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এই রকম একটি আদি দ্বন্দ্ব আছে। প্রকৃতির আশ্রয়ে জীবনদেবতার মালঞ্চে নিঃসঙ্গ মালাকর হবার জন্যে যেমন তিনি বারবার ব্যাকুল

আগ্রহে ছুটে গেছেন তেমনি ব্যাকুলতায় মানুষের কবি বারবার ফিরেও এসেছেন বছর প্রয়াগ তীর্থে—ভীড়ের কোলাহলে। বিশাল হৃদয়ের পরিচয় বৈচিত্র্যের একীকরণে নয়—সমীকরণে। বিরাট পুরুষদের চরিত্রে যাঁরা বিপরীতের মধ্যে হরগৌরীর মিলন খোঁজেন, ভক্তির আতিশর্যে তাঁরা দেখতে চান বিরাটের নির্বাণ। হৃদয়ে দ্বন্দ্বের তীব্রতাই মহামানুষদের জীবনে নিয়ে আসে নতুন নতুন কর্মপ্রেরণা—সৃষ্টি করে নতুন নতুন বিকাশের অধ্যায়। তাঁরা অন্তঃপ্রকৃতির বিভিন্ন উৎসকে একটি ধারায় মেলাতে গিয়ে তাঁদের স্বাভাবিক গতিধারাকে নষ্ট করেন না,—একই ভিত্তিভূমির ওপর বিভিন্ন উৎসকে বিভিন্ন ধারায় জাগিয়ে তোলেন। এইখানেই তাঁদের অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয়।

হায়দরাবাদ থেকে মান্দ্রাজে ফেরার পর বিবেকানন্দ তাঁর অনেকদিনের পুষে রাখা সংকল্প সম্বন্ধে প্রথম কাজে নামলেন। মন স্থির করে শিষ্যদের বললেন, আমি ভিক্ষুক। আমেরিকায় যাব গরীবের প্রতিনিধি হয়ে। সেই গরীব মধ্যবিত্ত ঘর থেকে তোমরা টাকা তোল, বড়লোকের দরজায় হাত পেত না। আলাসিঙ্গা পেরুমলের নেতৃত্বে ভক্ত যুবকদল ঘরে ঘরে চাঁদা তুলতে লাগল। আর্যজাতির বাণীপ্রচারের জন্যে মান্দ্রাজী তরুণেরা হল অগ্রগামী কর্মীদল। ইতিমধ্যে স্বামীজি শ্রীযুক্তা সারদা দেবীকে নিজের সংকল্প জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এই সময়ে তাঁর

কাছ থেকে জবাব এসে পৌঁছল। তিনি আশিস্ জানিয়ে স্বামীজিকে সাগর পারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন। স্বামীজি চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলেন। তাঁর মনে আর কোন দ্বিধা রইল না। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর যাত্রার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। এমন সময় এসে পৌঁছলেন খেতড়ির রাজার কাছ থেকে জগমোহনজি।

স্বামীজি যখন খেতড়িতে ছিলেন তখন নিঃসন্তান খেতড়িরাজ একদিন তাঁর কাছে সন্তানলাভের বর চান। বিশেষ পীড়াপীড়ির পর শেষে তিনি আশীর্বাদ করেন, রাজার যেন সন্তান হয়। আজ দু বছর পরে রাজার একটি ছেলে হয়েছে। স্বামীজিকে যেতে হবে সেই ছেলেকে আশীর্বাদ করার জন্যে। স্বামীজি সব কথা শুনে জগমোহনজিকে নিজের জলযাত্রার কথা বললেন। এ ক্ষেত্রে খেতড়ি যাওয়া তো সম্ভব নয়। কিন্তু জগমোহন নাছোড়বান্দা।

অনেকদিন পরে গুরুদেবকে পেয়ে খেতড়িরাজের আর আনন্দের সীমা নেই। কয়েকদিন উৎসবের মধ্যে কেটে গেল। তারপর স্বামীজি বিদায় নিলেন। জগমোহনজি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইএ এলেন। এখানে পেরুমল আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। এই সময়ে মহারাজের অনুরোধেই স্বামীজি অন্যান্য নাম ছেড়ে বিবেকানন্দ নাম

নেন। রাজগুরু রাজগুরুর মত যেন যান—তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয়। মহারাজ সেক্রেটারিকে এই হুকুম দিয়েছিলেন। তাই জগমোহনজি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে দামী পোষাক কিনে দিয়ে ৩১ মে বিবেকানন্দকে জাহাজে তুলে দিলেন। দি পেনিন্সুলার ও অরিয়েন্ট কোম্পানির 'পেনিন্সুলার' জাহাজ কলম্বোর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। স্বামীজির দৃষ্টিপথ থেকে ক্রমশ জন্মভূমির শেষ চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল।

পথের পথিক

সিংহল থেকে পেনাং, সিংগাপুর, হংকং, ক্যাণ্টন, নাগাসাকি, ইয়াকোহামা হয়ে তিনি ভ্যাংকুভার সহরে এসে নামলেন। সেখান থেকে ট্রেণে করে চিকাগোয় এসে পৌঁছলেন। এখানে এসে প্রথম বুঝতে পারলেন, অজান্তে তিনি কত বড় বিপদের মধ্যে পা বাড়িয়েছেন। তিনি শুধু শুনেছিলেন, আমেরিকার চিকাগো সহরে ধর্ম্মমহাসম্মেলন হবে। কখন হবে, কি ভাবে তাতে প্রতিনিধির আসন পাওয়া যায়—এ সব খবর নেননি, তাঁর শিষ্যেরাও নেবার দরকার মনে করেন নি। স্বামীজির সঙ্গে কোন পরিচয়-পত্র পর্যন্ত ছিল না। এমন কি শীতপ্রধান দেশের পোষাকের কথাও কেউ ভাবেন নি। জগমোহনজি এক দামী রেশমী আলখেল্লা কিনে দিয়েছিলেন। তাই পরে বিবেকানন্দ শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে চিকাগো সহরে পেঁাছলেন। তাঁর অদ্ভুত পোষাক দেখে লোকে বিদ্রূপ করতে লাগল। ছেলের দল ছুটল পিছু পিছু। তিনি সন্ন্যাসী—মালপত্র নিয়ে পথ চলা তাঁর অভ্যাস ছিল না। সঙ্গের মালপত্র নিয়ে তিনি

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মুটেরা যত পারলে তাঁকে ঠকালে। চিকাগোয় তখন 'ওয়াল্ড'স্ ফেয়ার' নামের মহামেলা বসেছিল। দশ বার দিন ধরে ঘুরে ঘুরে তাই দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি যেন এক নতুন জগতে এসে পৌঁছেছেন। চারিদিকে কি অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ—যন্ত্ররাজের কি অপূর্ব উদ্ভাবনী প্রতিভা! নীরব প্রশংসায় বিবেকানন্দের মন ভরে উঠল। তাঁর ভিতরে জ্বলছিল শক্তির দাবানল—আমেরিকায় বাহ্য-শক্তির স্ফুরণ দেখে তিনি আকৃষ্ট হলেন।

কিন্তু যে জন্যে তাঁর বিদেশে আসা সেই উদ্দেশ্যের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এসে দাঁড়াল। ইনফরমেশন ব্যুরো অব্ দি এক্সপোজিশন-এ গিয়ে তিনি শুনলেন, ধর্মসম্মেলন সেপ্টেম্বর মাসের আগে শুরু হবে না। আর যথারীতি কোন সংঘের পরিচয় চিঠি না থাকলে কারোকে প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয় না। তাছাড়া, প্রতিনিধি নেবার শেষ তারিখ অনেকদিন হল চলে গেছে। তাঁকে নেবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। তবু একবার চেষ্টা করে দেখবেন, তিনি ভাবলেন। তখন মাত্র জুলাই মাস। এদিকে অত দিন অপেক্ষা করার মত টাকার সম্বল তো স্বামীজির নেই। দিন তাঁর প্রায় তের চোদ্দ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছিল। দেশ থেকে পুঁজি তো আর তিনি বেশি নিয়ে আসেন নি। কিছুদিন পরে লোকমুখে জানতে পারলেন, বোষ্টন সহরে খরচ

অনেক কম পড়ে। ঠিক করলেন, সেখানেই কিছুদিন থাকবেন। বন্ধুহীন বিদেশে তাঁর উদ্বেগের শেষ নেই। তবু তিনি হটে যাবেন না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখবেন।

বোষ্টনের পথে ট্রেণে এক বড় লোক মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। তিনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় খুশি হয়ে নিজের বাড়ীতে থাকবার জন্যে স্বামীজিকে নেমতন্ন করলেন। বিবেকানন্দ তাঁর বাড়ীতেই দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের কোন সুবিধা হল না। দিন দিন তাঁর পুঁজি খালি হয়ে আসতে লাগল। মহা-সম্মেলনে প্রতিনিধি হবার আশা ছেড়ে দিয়ে ভাবলেন সহরে সহরে ধর্মপ্রচার করে বেড়াবেন। তার জন্যে আমেরিকায় দীর্ঘদিন থাকা দরকার। সে টাকা কোথায় পাবেন! নিরুপায় বিবেকানন্দ মান্দ্রাজী শিষ্যদের কাছে টাকা আর পরিচয়-পত্রের জন্যে চিঠি লিখলেন। না হলে তাঁকে হতাশ হয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে। তবু তাঁর আত্মবিশ্বাস অদম্য। আজ চারিদিকে তাঁর দুর্দিনের অন্ধকার—ক্ষীণতম আশার আলো কোনখানেও দেখা যাচ্ছে না। তবু নিঃসঙ্গ আকাশের ডানা-ভাঙা পাখীর মনে জয়ের দুর্জয় দুরাশা। তিনি যে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে এখানে এসেছেন—সেই বিরাটই তো তাঁর জীবনের পরিচালক। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২১ আগষ্ট ব্রিজি মিডোস থেকে বিবেকানন্দ যে চিঠিখানি লেখেন তাতে চমৎকারভাবে

ফুটে উঠেছে তাঁর তখনকার দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মনের ছবি। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"এখানে এসে পৌঁছবার আগে মনে যে সব মধুর স্বপ্ন ছিল তা ঘুচে গেছে। এখন আমাকে অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। হাজার বার মনে হয়েছে দেশে ফিরে যাই। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। প্রভুর আদেশ পেয়ে এখানে এসেছি। এখন আমি কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না বটে কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে কিছু এড়ায় না। মরি আর বাঁচি আমার কাজে লেগে থাকবই। * * *

"হতাশ হয়ো না। মনে রেখ ভগবান গীতায় বলেছেন, কাজে আমাদের অধিকার, ফলে নয়। কোমর বেঁধে লেগে পড়, বৎসগণ। প্রভুর ডাক শুনে আমি এ কাজে নেমেছি। সারাজীবন আমার কেটেছে দুঃখ দুর্গতি অত্যাচার সহ্য করে। আমার পরম স্নেহাস্পদদের চোখের সামনে প্রায় অনাহারে মরতে দেখেছি। যাদের উপকারের জন্যে চেষ্টা করেছি, তারাই আমাকে অবিশ্বাস করেছে, তাদেরই কাছে পেয়েছি উপহাস আর তাচ্ছিল্য। * * *

"বড়লোকদের ওপর নির্ভর করোনা। তারা বেঁচে থাকার চেয়ে বরং মরেই আছে বলা যেতে পারে। আশা শুধু তোমাদের ওপর— যারা সাধারণ, যারা সম্বলহীন কিন্তু যাদের প্রাণে আছে শ্রদ্ধা। ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নেই। দুর্গতদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব কর আর তাঁর কাছে সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা কর। সাহায্য আসবেই। এই চিন্তার বোঝা বুকে নিয়ে আমি বার বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন তা আমার মাথার মধ্যে গিজ গিজ করছে। তথাকথিত ধনী আর সম্ভ্রান্তদের দরজায়

দরজায় ধন্না দিয়েছি। যাদের বেদনার জ্বালায় আমার বুকের মধ্যে রক্ত ঝরছে তাদের সাহায্যের আশায় আধখানা পৃথিবী ঘুরে এই অপরিচিত দেশে এসে পৌছেছি। প্রভুর অনন্ত শক্তি আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করবেনই। এ দেশে অনাহারে কিংবা শীতের জ্বালায় আমার মরণ হতে পারে কিন্তু হে তরুণদল, তোমাদের কাছে আমি উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যাচ্ছি অজ্ঞ, নিঃসহায়, নিপীড়িতদের জন্যে আমার প্রাণের জ্বালা।"

চিঠি লেখার মাসখানেক পরে টাকার সম্বল প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। আর কোন উপায় না দেখে অবসাদে বিদ্রোহী বিবেকানন্দ শিষ্যদের কাছে টাকার জন্যে তার করলেন। চোখের সামনে ভেসে উঠল, ফিরে যাবার টাকা না এলে আমেরিকায় তাঁর শেষ পরিণাম কি হবে সেই ছবি। পণ্ড বুঝি হল তাঁর জীবনের ব্রত। প্রভুর নির্দেশ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ভেঙে গেল।

কাল মেঘের কোলেই বিদ্যুৎ স্ফুরণ। বিদেশে অসহায় বিবেকানন্দের যখন আশার শেষ রেশটুকু পর্যন্ত নিভে গেল তখন হঠাৎ এলেন এক বিদেশী বন্ধু। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জে, এচ, রাইট তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর প্রতিভায় এমন মুগ্ধ হলেন যে তিনি নিজে থেকে তাঁকে যতদূর সাধ্য সাহায্য করবার জন্যে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন।

স্বামীজি ধর্মসম্মেলনে যোগ দেবার সংকল্প ছেড়ে দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত রাইট বোঝালেন, তাতে যোগ দিলে একসঙ্গে সারা আমেরিকাকে আকর্ষণ করার সুযোগ পাবেন তিনি। কিন্তু বিবেকানন্দের যে কোন পরিচয়-পত্র নেই। পরিচয়হীন, দলহীন সন্ন্যাসীকে যে তাঁরা স্বীকার করতে চান না। শ্রীযুক্ত রাইট এই বাধার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, স্বামী, আপনার কাছে পরিচয়-চিঠির জন্যে পীড়াপীড়ি করা আর সূর্যদেবকে জগতে আলো দেবার জন্যে তাঁর কি অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা একই কথা। ধর্মসম্মেলনের প্রতিনিধি-নির্বাচন-উপসমিতির সভাপতি রাইটের একজন বন্ধু। তিনি তাঁর নামে চিঠি দিলেন। লিখলেন, এই পত্র-বাহকের জ্ঞান এমন বিশাল যে আমাদের সমস্ত বিদ্বান অধ্যাপকদলের পাণ্ডিত্য একসঙ্গে করলেও তাঁর জ্ঞানের সমান হবে না। তিনি আরো অনেক প্রতিপত্তিশালী বন্ধুকে দেবার জন্যে চিঠি দিলেন। আভাসে জানতে পেরেছিলেন, সন্ন্যাসীর হাতে পুঁজি কিছু নেই, তাই যাবার দিন চিকাগোর টিকিটখানি তিনিই কিনে দিলেন।

বিবেকানন্দের আনন্দের শেষ নেই। এই অভাবনীয় সাহায্য তো প্রভুর ভালবাসার ইঙ্গিত। তাঁর জীবন-বিধাতা তা হলে আজো তাঁকে ত্যাগ করেন নি। ক্ষণিকের দুর্বলতার জন্যে মনে মনে তাঁর লজ্জা হল। আজ তাঁর

ভয় নেই, প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তিনি যন্ত্রী, বিবেকানন্দ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র মাত্র। তিনিই আজ পূর্ব দিগন্তে আশার আলো রাঙিয়ে তুলেছেন। মনের আনন্দে বিবেকানন্দ আবার এসে নামলেন চিকাগো সহরের স্টেশনে। কিন্তু একি! ধর্মসম্মেলনের কার্যালয়ের ঠিকানা রাইট লিখে দিয়েছিলেন। খুঁজতে গিয়ে দেখেন সেই কাগজখানা হারিয়ে ফেলেছেন। স্বামীজি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এত বড় সহরে কোথায় তিনি ঠিকানার খোঁজ করবেন? দু চার জন পথের লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কেউ বলতে পারলে না। তাঁকে দেখে লোকে মনে করলে কালা কাফ্রী। কাফ্রীর কথা মন দিয়ে কে শুনবে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। কনকনে শীত। অজানা সহর। কেউ একটা হোটেল পর্যন্ত তাঁকে দেখিয়ে দিলে না। অগত্যা আশ্রয়ের অভাবে স্টেশনের একটা খালি মালের বাক্সের মধ্যে শুয়ে তাঁর রাত কাটল।

পরের দিন ভোরে উঠে তিনি বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিতে তো তারা শেখে নি। তাঁর মুখের ওপরেই কেউ ঘৃণায় দরজা বন্ধ করে দিলে, কোথাও বা চাকরেরা গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। ঘুরে ঘুরে তিনি ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়লেন। মনে আবার হতাশা জাগল, তবে কি মহা-

সম্মেলনে তাঁর যোগদান প্রভুর ইচ্ছা নয়? নিষ্ঠুর এই সংসার, তার চেয়েও নিষ্ঠুর মানুষের বিধাতা।

—আপনি কি ধর্মমহাসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি?

স্বামীজি মুখ ফিরিয়ে দেখেন একজন ভদ্রমহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন। তিনি জবাব দিলেন, ঠিক প্রতিনিধি নই, প্রতিনিধি হবার জন্যে এসেছি।

—তবে এখানে বসে আছেন কেন? মহিলাটি আবার প্রশ্ন করলেন।

একে একে স্বামীজি তাঁর সকল কথা বললেন। মহিলাটি তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। তিনি ঠিকানা জানতেন। তিনিই স্বামীজিকে যথাস্থানে নিয়ে যাবেন, আশ্বাস দিলেন। ইনিই শ্রীমতী জর্জ ডবলিউ, হেল। পরে ইনি এবং এঁর স্বামী বিবেকানন্দের পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

বিজয়মালা

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর, সোমবার বেলা দশটার সময় চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন শুরু হয়। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে বিখ্যাত পুরোহিত ও পণ্ডিতদল সভায় যোগ দিয়েছিলেন। বেদীর মাঝখানে বসেছিলেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নায়কপ্রধান কার্ডিনাল গিবন্স। তাঁর দু দিকে ছিলেন প্রাচ্যের প্রতিনিধিরা, ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত প্রতাপ মজুমদার, সিংহলের বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত ধর্মপাল, জৈন শ্রীযুক্ত গান্ধী, থিওসফিষ্ট শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী। তাঁদের মধ্যে পরিচয়হীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী তরুণ বিবেকানন্দ। বয়স ত্রিশের বেশি নয়। মুখে চোখে দীপ্তির আকর্ষণ, গায়ে গৈরিক আলখেল্লা আর গৈরিক পাগড়ির চমৎকার বেশ। একে একে সভাপতির আদেশে প্রতিনিধিরা বক্তৃতা দিতে লাগলেন। সকলের মুখে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বক্তব্য। তাঁর সময় এলে তিনি উঠতে পারলেন না। এত বড় সভায় হাজার হাজার লোকের সামনে কেমন করে বক্তৃতা দেবেন! অপর

সকলেই বক্তৃতা তৈরি করে এনেছিলেন। তিনি অনভিজ্ঞ, —জানতেন না। এখন মুস্কিলে পড়লেন। সভাপতি তাঁকে আরো কয়েকবার ডাকলেন, প্রতিবারেই তিনি বলে পাঠালেন, এখন নয়—পরে। অবশেষে সভা ভাঙার আগে তাঁকে শেষবার ডাক দেওয়া হল। এবার বক্তৃতা দিতে না এলে আর তাঁকে সুযোগ দেওয়া হবে না। স্বামীজি গুরুকে স্মরণ করে এসে দাঁড়ালেন বক্তৃতার মঞ্চে। বুক তাঁর দুরু দুরু করে কাঁপছে। ভয়ে ছলছল চোখে একবার দেখে নিলেন সেই বিরাট দর্শকমণ্ডলীকে—হলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে তাঁরা বসে আছেন। মুহূর্তে তাঁর মনে হল, তিনি কে—যিনি তাঁকে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে এতদূরে নিয়ে এসেছেন তাঁর কথা তিনিই বলবেন। তাঁর অজ্ঞাতে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা আমেরিকাবাসীদের পরমাত্মীয় বলে ডাক দিলেন —এক নিমেষের মধ্যে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আমেরিকাবাসী ভাইবোনেরা !

—সাধু, সাধু, সাধু।

ঘন ঘন হাততালি আর সাধুধ্বনির মধ্যে বিবেকানন্দের কণ্ঠ লুপ্ত হয়ে গেল। এমন আত্মীয়তার সুর আর কোন বক্তার মুখে তো শোনা যায় নি ! স্বামীজি প্রথমে অবাক হয়ে ভাবলেন, এমন বিপুলভাবে কার জয়ধ্বনি এরা করছে ! তারপর তাদের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রাণের

আবেগে তিনি বক্তব্য বলে চললেন। কথা তাঁর বেশি নয় কিন্তু তাঁর মতধারার বিরাট ঔদার্যে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসীসমাজের পক্ষ থেকে তিনি সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, হিন্দুধর্ম সকল মানুষকে শুধু সমান ভাবে—তাই নয়, সকল ধর্মমতকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষ জগতের উৎপীড়িত বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বারবার নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছে। তিনি দুটি সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যা করে নিজের বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তুললেন ঃ

"সকল নদীর যেমন সমুদ্রই একমাত্র গম্যস্থান, হে প্রভু, ভিন্ন ভিন্ন রুচির ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুগামীদের তেমনি তুমিই একমাত্র লক্ষ্য।"

"যে যেমন মতবাদের আশ্রয় নেয় আমি তাকে সেই ভাবেই কৃপা করি। হে অর্জুন, মানুষেরা সকলে আমারই নির্দিষ্ট পথের অনুসরণ করে।"

অপর বক্তারা শুনিয়েছিলেন তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার কথা—তিনিই কেবল শোনালেন তাঁর কথা যিনি সকল মানুষের ভগবান।—যিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও কোন সম্প্রদায়ের নন।

প্রথম দিনের পর সম্মেলনে তাঁকে আরো কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হয়। প্রত্যেকবারেই হিন্দুদর্শনের ওপর ভিত্তি করে নব নব ভাষায় তিনি এক অপূর্ব বিশ্বধর্ম প্রচার

করলেন। প্রাচীন তত্ত্বগুলিকে তিনি তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নতুন নতুন ব্যাখ্যায় প্রাণবন্ত করে তুললেন। একদিনের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ

"সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম বা খৃষ্টানের ধর্ম বা মুসলমানের ধর্ম হবে না। তা হবে সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ অথচ তাতে ভবিষ্যৎ বিকাশের অনন্ত পথ খোলা থাকবে। সেই ধর্ম এতদূর ব্যাপক হবে যে তা অসংখ্য হাত বাড়িয়ে জগতের সমস্ত নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে। যাদের বুদ্ধি পশুর মত বললেও অন্যায় বলা হয় না, এ রকম মানুষ থেকে যাঁরা নিজেদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের মহান শক্তিতে নিখিলের মানুষগোষ্ঠীর পূজার আসন পেয়েছেন, সমাজ যাঁদের ভিড়ের মানুষ বলে গণ্য না করে দেবতার মত সম্মান করে, সেই পুরুষসিংহদের পর্যন্ত সকলকে নিজের বুকে আশ্রয় দেবে। সে ধর্ম এমন হবে যে তাতে কারো ওপর বিদ্বেষ বা পীড়নের অবসর থাকবে না। তা প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে যে দেবতা রয়েছেন তাঁকে স্বীকার করবে, আর মানুষ যাতে সেই দেবভাব উপলব্ধি করতে পারে তার জন্যে তার সমস্ত শক্তি নিয়ত নিয়োগ করবে।

"এই রকম ধর্ম সৃষ্টি করুন, সকল জাতিই আপনাদের অনুগামী হবে। অশোকের মহাধর্ম সম্মেলন হয়েছিল শুধু বৌদ্ধদের জন্যে। আকবরের ধর্মসম্মেলন যদিও সার্বভৌম ছিল তবু তা আকারে একটা মজলিসের বড় ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আছেন এক ভগবান—এ বাণী ঘোষণা করার দায়িত্ব আজ আমেরিকার।

"যিনি হিন্দুদের ব্রহ্ম, পারসিদের অহুর মজদ্, বৌদ্ধদের বুদ্ধ,

ইহুদীদের জিহোবা, খৃশ্চানদের স্বর্গস্থ পিতা, তিনি আপনাদের শক্তি দিন।"

সম্মেলনের শেষদিনে তিনি আরো স্পষ্ট করে তাঁর মত প্রচার করেছিলেন ঃ "ধর্মসমন্বয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হল। এখন আর সে বিষয়ে আমার নিজের মত কি তা আলোচনা করব না। কিন্তু যদি এখানে কেউ এমন আশা করেন যে ঐ সমন্বয় হবে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির প্রাধান্য আর অপরগুলোর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে, তাহলে তাঁকে আমি বলব, ভাই, তোমার আশা সফল হওয়া অসম্ভব। আমার কি ইচ্ছে, কোন খৃশ্চান হিন্দু হন? ভগবান যেন তা না করেন। আমার কি ইচ্ছে, কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ খৃশ্চান হন? ভগবান তেমন কাজ নিবারণ করুন। বীজ মাটির মধ্যে পোতা হয়। মাটি, জল বা হাওয়া তার চারিদিকে থাকে। সেই বীজটি কি বড় হয়ে মাটি, জল বা হাওয়া কোন একটিতে পরিণত হয়? না। সেই বীজ থেকে জন্মায় গাছের চারা। তা ক্রমে প্রকৃতির নিয়মে বাড়তে থাকে। আর মাটি, জল, হাওয়ার উপাদানে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ করে কালে মহীরূহে পরিণত হয়। ধর্ম-সম্বন্ধেও ঐ রীতি। খৃশ্চানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না। হিন্দু বা বৌদ্ধকে খৃশ্চান হতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অপর অপর ধর্মপথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলো নিজের মধ্যে গ্রহণ করে শক্তি লাভ করবে—নিজের বিশেষত্ব বর্জন না করে আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হয়ে উঠবে।

"যদি এই ধর্মমহাসম্মেলন জগতে কিছু প্রমাণ করে থাকে তা হচ্ছে এই। পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি, দাক্ষিণ্য পৃথিবীর কোন

একটি সম্প্রদায় বিশেষের একার সম্পত্তি নয়—প্রত্যেক সাধন-প্রণালীতেই মহা মহা নরনারীর সৃষ্টি হয়েছে। * * * * অনতিবিলম্বে জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পতাকার ওপর লেখা থাকবে, বিবাদ করো না, পরস্পরকে সাহায্য কর, কারো ধ্বংসের চেষ্টা না করে অপরের ভাব নিজের মধ্যে একীকরণের চেষ্টা কর। দ্বন্দ্ব নয়,—মৈত্রী ও শান্তি মানুষের চরম লক্ষ্য।"

ভিক্ষুকের জয়গানে সমস্ত আমেরিকার দিকবিদিক ভরে উঠল। ধর্মসম্মেলনে এমন করে কেউ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের প্রাণের কথা বলতে পারেন নি। কাগজে কাগজে তাঁর বিবরণ প্রকাশিত হতে লাগল। "দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড" লিখলে, "নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তিনিই মহাসম্মেলনের প্রধান বক্তা। তাঁর কথা শোনার পর মনে হয়, মহাজ্ঞানী ভারতীয়দের কাছে এদেশ থেকে ধর্মপ্রচারক পাঠানো কি মূর্খতা।" রাস্তায় রাস্তায় তাঁর ছবি বিক্রি হতে লাগল। নানা ধর্মপিপাসু মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। কয়েকজন তাঁর পরম বন্ধু জুটল। তিনি অপরিচিতদের দেশে পেলেন একান্ত স্নেহের আশ্রয়। তাঁর আর নিজের খরচের ভাবনা রইল না। নানা লোকে তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হবার জন্যে তাঁকে নেমন্তন্ন করলেন। তাঁকে অতিথিরূপে পাওয়া যেন গর্বের কথা। তাঁর সঙ্গে পরিচয় যেন সৌভাগ্যের চিহ্ন।

তরুণ যৌবনে এ রকম সম্মান মানুষের জীবনে একান্ত

দুর্লভ। তাঁর সৌভাগ্যে অনেকেরই মনে মাৎসর্য জেগেছিল। কোন কোন ভারতীয় প্রতিনিধি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা প্রচার করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। আর গোঁড়া খৃশ্চান পাদ্রীরা অনেকে তো তাঁর নির্মল চরিত্রের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করতে শুরু করেছিলেন। ভারতের পাদ্রীরাও তাতে ইন্ধন জোগাতে কসুর করেন নি। এত বিপুল যশ পেয়ে বিবেকানন্দের মনে কিন্তু কোন অহংকার জাগে নি। বরং এর জন্যে তাঁর মনঃকষ্টের শেষ ছিল না। যশের সঙ্গে লুপ্ত হয়েছিল তাঁর সন্ন্যাসীজীবনের নিরুপদ্রব স্বাধীনতা। এতদিন তিনি ছিলেন পথের পথিক। কারো মন জুগিয়ে চলার দরকার তাঁর ছিল না। আজ পদে পদে আসবে লৌকিকতার ঝঞ্ঝাট। হিমালয়ের বুকে পাহাড় থেকে পাহাড়ে যে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ নিজের খেয়ালে সাধনভজনে দিন কাটাত, আজ আর তাকে পাওয়া যাবে না। তাঁর জীবনকাহিনীর নব পরিচ্ছেদের কথা ভেবে তিনি শিশুর মত কেঁদেছিলেন।

বিদেশে তাঁর নামও খুব হল, খাতিরও খুব পেলেন। কিন্তু যে গরীব ভারতবাসীর সেবার জন্যে তিনি সাগর-পারে পাড়ি দিয়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য কতদূর এগোল? সম্মেলন শেষ হবার পর বিবেকানন্দ এক বক্তৃতাপ্রযোজক কোম্পানির সঙ্গে কনট্র্যাক্ট করে আমেরিকার সহরে সহরে বক্তৃতা দিতে বেরুলেন। হাতে কিছু টাকা জমল কিন্তু

বেশিদিন এ কাজ করতে পারলেন না। গুরুর মত টাকার সংস্পর্শে তিনি স্বস্তি পেতেন না। বণিকদলের সঙ্গে টাকার লেন দেন করে অচিরে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল, তিনি সন্ন্যাসী, সাধারণ সংসারী বক্তার মত টাকা নিয়ে ধর্মপ্রচার করা তো তাঁর শোভা পায় না। উপনিষদের সত্য নিয়ে বণিকবৃত্তি! অমৃতের সন্ধান দিয়ে বিষ অর্জন! তা ছাড়া, তাঁর কার্যকুশল মন বুঝেছিল বড় বড় সভায় যেখানে বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ের নিবিড়তা নেই, যেখানে সাধনজীবনের আগ্রহের চেয়ে লোকপ্রিয় বক্তার কথা পয়সা দিয়ে শোনাই শ্রোতার যোগদানের প্রধান প্রেরণা, যেখানে বক্তার স্বাধীনতা নেই, অর্থলোলুপ বণিকদের নির্দেশমত বক্তৃতা দিতে হয়— সেখানে ফাঁকা বক্তৃতা দিয়ে সত্যিকার কোন প্রচার কাজ করা যাবে না,—তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করার ভিত্তিভূমি তৈরি করা সম্ভব নয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেট্রএট-এ বণিকদলের সংস্পর্শ ছাড়লেন।

ইতিমধ্যে তাঁর সাফল্যের কথা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। এখানকার কাগজে কাগজে তাঁর বক্তৃতা এবং কীর্তির খবর ছাপা হচ্ছিল। মঠের গুরুভাইদের আনন্দের আর সীমা নেই। পরমহংসদেব যা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এতদিনে তা ফলেছে। ভারতবর্ষ তার সাগর পারের তরুণ প্রতিনিধির জয়গানে মেতে উঠল,—একদিক

থেকে আর একদিকে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। কলকাতা ও মান্দ্রাজ সহরে বিখ্যাত লোকদের উদ্যোগে বিরাট সভায় তাঁর গুণগান কীর্তন করা হল। তাঁর উদ্যম এবং আমেরিকাবাসীদের আতিথ্যের সকৃতজ্ঞ প্রশংসা করে অভিনন্দন পাঠানো হল। রামনাদ ও খেতড়ির রাজারা তার যোগে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

কিন্তু বিবেকানন্দের বিশ্রাম নেই। শ্রীচৈতন্যের মত নিয়ত তিনি আমেরিকার নগরে নগরে ঘুরে বেদান্তের বাণী বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। এবার আর টাকার বিনিময়ে নয়। স্বাধীনভাবে সাধারণ সভায় হয় বক্তৃতা, না-হয় লোকের বাড়ীতে বৈঠকী আলোচনা হতে লাগল। এইভাবে এক বছরের মধ্যে তিনি আটলান্টিক উপকূল থেকে মিসিসিপি নদীর তীর পর্যন্ত সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান সহরে ঘুরে বেড়ালেন। ডেট্রএট-এ তাঁর একমাস কেটেছিল মিচিগানএর ভূতপূর্ব গভর্নরের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী জন, এইচ, ব্যাগলির বাড়ীতে। তারপর দু সপ্তাহের জন্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, পামারের অতিথি হন। ইনি বিশ্বশিল্পমেলা-পরিষদের সভাপতি এবং স্পেনদেশে আমেরিকার রাজদূত ছিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী গ্রিনডেল-এর প্রথম দেখা হয়। এই মহিলা পরে দীক্ষান্তে সিষ্টার ক্রিশ্চিনা নাম নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। চিকাগো সহরে প্রায়ই তিনি

থাকতেন শ্রীযুক্ত হেল-এর কাছে। ডেট্রএট-এর ইউনিটেরিয়াল চার্চ-এ এক প্রস্থ বক্তৃতা দেবার পর স্বামীজি একে একে চিকাগো, নিউইয়র্ক, বোষ্টন, গ্রীণ একার, ব্রুকলিন-এ গেলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউইয়র্ক-এ তিনি প্রথম তাঁর মনের মত ভাবে কাজ শুরু করলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, নগরে নগরে ঝড়ের মত ঘুরে বেড়িয়ে পরের নিমন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে কোন স্থায়ী কাজ আশা করা যায় না। তাই এবার নিউইয়র্ক-এ নিজেই একখানা ঘর ভাড়া করে রীতিমত ক্লাস খুলে বিনামূল্যে সর্বসাধারণের সাধন শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। প্রথমে তাঁর বড়লোক বন্ধুরা এ কাজ পছন্দ করেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন, স্বামীজি তাঁদের নির্দেশ মত শুধু বড় ঘরের লোক নিয়ে কাজ করবেন। বিবেকানন্দকে তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাঁদের কাছ থেকে এই রকম ইঙ্গিত পেয়ে তিনি মর্মাহত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, কি, জগতে কোন দিন বড় লোককে দিয়ে কোন বড় কাজ হয়েছে! এ পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে—মানুষের বুদ্ধি আর হৃদয়ের জোরে—টাকার জোরে নয়। শিব, শিব! বড়লোকের করুণার দাস হব আমি!

তিনি মধ্যবিত্ত তত্ত্বপিপাসু শিষ্যদের নিয়ে ক্লাস খুলে জুন মাস পর্যন্ত উপনিষদ ব্যাখ্যা করলেন। পয়সার অভাবে বসবার চেয়ার মেলে নি। ছাত্রেরা আসনপিঁড়ি

হয়ে বসতেন। ক্রমেই অনুসন্ধিৎসুদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ছোট কামরা ছেড়ে আর একটি বড় কামরা ভাড়া করা হল। এই সময়ে প্রতিদিন বাছা বাছা কয়েকজনকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। ধ্যান শেখাতে শেখাতে সময়ে সময়ে নিজে এমন ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন যে সহজে বাহ্য চৈতন্য ফিরে আসত না। এই বছরের প্রায় জুন মাসে তাঁর "রাজযোগ" * বই ছাপা হয়।

ক্রমশ দু-একটি করে সত্যিকার অনুসন্ধিৎসু অন্তরঙ্গ এসে জুটতে লাগলেন। স্বামীজি স্থির করলেন, তাঁদের নিয়ে আরো গভীরভাবে কাজ আরম্ভ করবেন। সেণ্ট-লরেন্স নদীর থাউস্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক নামের দ্বীপে এক শিষ্যার একখানি বাগানবাড়ী ছিল। জুন মাসে নিউইয়র্কের কাজ শেষ করে তিনি সবসুদ্ধ বারজন অন্তরঙ্গ নিয়ে সেইখানে প্রায় দেড়মাস কাটালেন। জায়গাটি যেমনি সুন্দর, তেমনি নির্জন। পাহাড়ের ওপরে চারিদিকে বন—তার মাঝখানে তাঁদের বাগান-ঘেরা বাড়ী। চারিদিক খোলা। যেদিকে চোখ যায়—ওপরে কেবল বিপুল আকাশ আর নীচে নদীর অফুরন্ত জলরাশি। মাসের পর মাস

* স্বামীজি মুখে বলে যেতেন আর একজন শিষ্যা শ্রীমতী এস, ই, ওয়ালডো (পরে তাঁর নাম হয়েছিল সিষ্টার হরিদাসী) লিখে নিতেন। এইভাবে বইখানা রচনা করা হয়।

নগরের কোলাহলে মানুষের ভীড়ের মধ্যে কাজের চাপে স্বামীজির শরীরমনে অবসাদ এসেছিল। এখানে প্রকৃতির বুকে মনের মত কয়েকজন মানুষের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় তিনি নিজেকে আবার ফিরে পেলেন। এতদিন আমেরিকায় মহা ঐশ্বর্যের মধ্যে স্থায়ী কাজের আশা তিনি করেন নি। আজ হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, এই মহাজাতির একদিকে আছে ঐশ্বর্যের দুর্জয় সাধনা আর একদিকে অন্তরের গোপন কোণে জ্বলছে অধ্যাত্মলাভের তীব্র বাসনা। থাউস্যাণ্ড আইলাণ্ড পার্কের বিজন প্রান্তরে তিনি সেই অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই এখানে শুধু তিনি হিন্দুর বিরাট তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেন নি, সাধন-জীবনের সন্ধান দেবারও চেষ্টা করেছিলেন। সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত ক্লাস বসত। তাতে একদিকে চলত সেণ্টজনের গস্‌পেল, বেদান্তসূত্র, গীতা, নারদভক্তিসূত্র, যোগদর্শন, কঠ উপনিষদ প্রভৃতির পাঠ ও আলোচনা আর একদিকে ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা। এই সময়কার আলোচনা শ্রীমতী ওয়ালডো নিজের দিনপঞ্জীতে টুকে রাখতেন। পরে সেই লেখা সংকলন করে "ইন্সপায়ার্ড টক্‌স্‌" নামে বই প্রকাশিত করা হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত স্বামীজিও বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন এক নয়। তাই প্রত্যেককে তিনি আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন মানুষের নিজের নিজের

ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সাধনই আমার লক্ষ্য। ব্যক্তিগত ভাবে তাদের গড়ে তোলা ছাড়া আমার আর কোন উচ্চাশা নেই। জীবনে যদি এমন কি একজনকেও মুক্তিলাভে সাহায্য করতে পারি, তাহলে মনে করব, আমার সব চেষ্টা সফল হয়েছে। ভারতবর্ষে পরে যেমন তিনি মঠ প্রতিষ্ঠা করে একটা সংঘ গড়ে তুলেছিলেন, আমেরিকায় এ রকম দল করার ইচ্ছা তাঁর কোন দিন ছিল না। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দল গড়তে তিনি কোথাও চাইতেন না। তাঁর এবং পরমহংসদেবের প্রকৃতির মধ্যে চিরদিন এমন একজন ছিলেন যিনি মূলত পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের ওপরে—নিরাসক্ত নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু জটিল বিবেকানন্দের চরিত্র। এই অসাম্প্রদায়িক নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করে গেছেন ভারতের বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীসংঘ। এদেশে ঘরছাড়াদের নিয়ে তিনিই প্রথম ঘর বাঁধার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

থাউসাণ্ড আইলাণ্ড পার্কে বাসের পর দুজন আমেরিকাবাসী প্রথম তাঁর কাছে সন্ন্যাসের দীক্ষা নেন। একজন শ্রীমতী মেরী লুই। জাতিতে ইনি ছিলেন ফরাসী কিন্তু অনেকদিন থেকে নিউইয়র্কে বাস করছিলেন। সহরের সমাজতন্ত্রী সমাজে তাঁর খুব খাতির ছিল। তিনি নির্ভীক এবং বিদুষী ছিলেন। দীক্ষার পর এঁর নাম হয় অভয়ানন্দ। আর একজন রুষ জাতীয় ইহুদী ভদ্রলোক। নিউইয়র্কের

একখানা বিশিষ্ট খবরের কাগজের পরিচালক ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে নাম নেন কৃপানন্দ।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শ্রীযুক্ত ই, টি, স্টার্ডির সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করতে যান। ডিসেম্বর মাসে নিউইয়র্কে ফিরে কর্মযোগ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। পরে এই বক্তৃতাগুলি নিয়ে "কর্মযোগ" নামে বই প্রকাশিত হয়। অনেকের ধারণা, এখানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ বই। এতদিন তাঁর বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করার কোন আয়োজন করা হত না। সভায় দাঁড়িয়ে গুরু গম্ভীর কণ্ঠে এমন অনর্গল তিনি বলে যেতেন যে খবরের কাগজের সংবাদদাতাদের পক্ষে তা হুবহু লিখে নেওয়া অসম্ভব ছিল। গত দু বছর ধরে তাঁর মুখের কত অমূল্য কথা এমনিভাবে অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে। শিষ্যেরা ঠিক করলেন, আর নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। এখন তাঁরা মণিমুক্তায় ভরা রত্নখনির সন্ধান পেয়েছেন—সেই দুর্লভ ঐশ্বর্যের এক কণাও হাতছাড়া করতে চান না। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর একজন লিপিকারকে নিযুক্ত করা হল। নাম শ্রীযুক্ত জে, জে, গুডউইন, জাতিতে ইংরেজ। আমেরিকায় এসেছিলেন কাজের সন্ধানে। বিশেষ আদর্শ-বাদী তাঁর মন নয়। বরং সব-দিক-বজায়-রাখা সাংসারিক তিনি। জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছল। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার ফলে বিষয়বুদ্ধিতে কাঁচা

ছিলেন না। কিন্তু স্বামীজির সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। পয়সা উপায় করতে এসে তিনি নিলেন সবহারা ভিখারীর পরিচর্যার ভার। আশ্চর্য তাঁর ক্ষমতা ছিল। তাঁর কাছে বেদান্তের বিষয়গুলি সম্পূর্ণ নতুন। অথচ স্বামীজির বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ হুবহু তিনি সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখে নিতেন। কখনো কখনো সারাদিন অবিশ্রাম তাঁকে পরিশ্রম করতে হত। বক্তৃতার পর বক্তৃতা টুকে ভাষান্তর করে টাইপ করে প্রেসে পাঠাতে হত। শুধু তাই নয়। ক্রমশ তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন স্বামীজির পরিচর্যার ভার। একদিনের জন্যে তাঁর কাছ ছাড়া হতেন না। সঙ্গে সঙ্গে সহরে সহরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ছিলেন স্বামীজির ডান হাত।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউইয়র্কের তাঁর ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি দেওয়া হয়। এখানেই শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস লেগেটের সভাপতিত্বে বিবেকানন্দ বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমে এই সমিতিই আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিছুদিন পরে বোষ্টন, ডেট্রয়েট, হার্ভাড প্রভৃতি জায়গায় তিনি প্রচার করেন। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনে অধ্যাপকমণ্ডলী এবং কর্তৃপক্ষ এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে প্রাচ্যদর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করা হয়। সন্ন্যাসী তিনি, বিশ্বের ঘরে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করে নিয়ে

আসার দায়িত্ব তাঁর। তিনি আধুনিক মানুষের মুক্তিদূত—সামান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করার অবসর তাঁর কোথায়!

এই সময়ে ইংলণ্ডের বন্ধুগণ স্বামীজিকে ফিরে আসার জন্যে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। কয়েকমাস ইংলণ্ডে থেকে এর আগে তিনি বেদান্ত আন্দোলনের যে সূচনা করেছিলেন, তা তাঁর অবর্তমানে লুপ্ত হয় নি। বরং পরিচিত বন্ধুদের নবজীবন লাভের আগ্রহ তীব্রতর হয়েছে। বিবেকানন্দ আমেরিকার কাজ পরিচালনের জন্যে শিষ্যদের যথোচিত নির্দেশ দিয়ে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে দ্বিতীয়বার যাত্রা করলেন।

আমেরিকার শিষ্যেরা অবশ্য তাঁকে সহজে ছাড়তে চান নি। তিনি তো শুধু তাঁদের ধর্মপথের পরিচালক নন, তিনি যে তাঁদের বন্ধু, পরামর্শদাতা, পরমাত্মীয়। নিরাসক্ত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনে এই বৈশিষ্ট্য আমরা বার বার দেখেছি—মানুষের আকর্ষণকে তিনি কখনো মায়া বলে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন নি। যখন যেখানেই গেছেন, অপরিসীম ভালবাসার বাঁধনে পাগল একদল মানুষকে তিনি নিবিড় ভাবে পেয়েছেন। তাঁর শেখানো তত্ত্বের চেয়ে তাঁকেই তারা বেশি আপনার বলে ভাবতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হৃদয়ে স্নেহের অভাব ছিল না। কিন্তু ঠিক এই পরমাত্মীয়ের অন্তরঙ্গতা তাঁর কাছ থেকে কেউ কখনো পান নি। কোথায় যেন একটা

আড়াল সকলের অলক্ষ্যে বরাবর থেকে যেত। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ছিল দুস্তর মানবিকতা। সংসারবিবাগীর মত জীবনকে তিনি বর্জনের পথে নেন নি—নিয়েছিলেন গভীরভাবে। শিষ্যদের সঙ্গে তিনি সব সময়ে ধর্মপ্রচারকের গুরুগম্ভীর মূর্তিতে মিশতেন না। তাদের নিয়ে অনেক সময়ে বন-ভোজনে যেতেন। সেখানে নিজে হাতে রান্না করে তাদের খাওয়াতেন। কখনো কখনো তরকারিতে বেশি ঝাল দিয়ে মজা দেখতেন। তিনি বাড়ীতে আতিথ্য নেবেন শুনলে শিষ্য বন্ধুরা আনন্দে মেতে উঠতেন। এ শুধু তাঁদের সম্মানের কথা নয়। আনন্দের কথাও। হাসি, তামাসা, গল্প, উপদেশে বাড়ীর চারিদিক তিনি মুখর করে তুলতেন। তাঁর কথাবার্তা যেমনি সরস, তেমনি চমৎকার। তাঁকে কেন্দ্র করে বাড়ীতে কয়েকদিন কল্পলোক সৃষ্টি হয়ে উঠত। গুরু হিসাবে তিনি ছিলেন কঠোর—তিনি ছিলেন একান্ত দূরের মানুষ। তাঁর নাগাল পাওয়া ভার। কিন্তু বন্ধু হিসাবে তাঁর স্বভাব ছিল মধুর মত মিষ্টি। মনে হত, যেন নিতান্ত কাছের মানুষ—আমাদেরই একজন। ঘরের লোকের মত তিনি অন্তরঙ্গদের নতুন নতুন নামকরণ করতেন। স্নেহে কারোকে ডাকতেন, জো জো, কারোকে যুম, কারোকে ফাদার পোপ, কারোকে বা মাদার চার্চ।

* * *

আমেরিকায় প্রথম এসে দিকে দিকে যে মহাশক্তির প্রকাশ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন, পরে অবশ্য সেই মোহ তাঁর অনেকটা কেটে গেছল। আমেরিকাবাসীকে সে কথা নির্ভয়ে বলতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তাঁদের আসুরিক কাঞ্চনমোহ, ধর্মের নামে নীচতা ও শঠতা, হাল্কা হুজুক-প্রিয়তার বিরুদ্ধে বারবার বক্তৃতায় কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু আমেরিক সভ্যতার প্রভাবে দুটি বিষয়ে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়। একটি গরীবদের সেবা সম্বন্ধে আর একটি মেয়েদের আত্মবিকাশ সম্বন্ধে। ভারতবর্ষের এক কোণ থেকে আর এক কোণে ঘুরে তিনি ক্ষুধায় কাতর, রোগে পঙ্গু, সম্বলহীন, বন্ধুহীন, নিপীড়িত গরীবদের দুঃখ দেখেছিলেন। কিন্তু সে দুঃখ কত অমানুষিক তা প্রথম বুঝতে পারেন সাগরপারে গিয়ে। বিপরীতের সংস্পর্শে অনেক সময় বস্তুর যথার্থরূপ ফুটে ওঠে। শিষ্যবন্ধুদের বাড়ীতে অতিথিরূপে নানা ঐশ্বর্যের আবেষ্টনে তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন। রাত্রে মহামূল্য পালঙ্কে শুয়ে তাঁর ঘুম আসত না। মনে পড়ত, সাত সমুদ্র তের নদী পারে তাঁর কোটি কোটি ভাইবোনেরা অনাহারে রোদবৃষ্টি মাথায় করে ভাঙা কুটিরের মধ্যে পশুর মত দিন কাটাচ্ছে। বৈদান্তিকের চোখ দিয়ে অশ্রুর স্রোত বয়ে যেত। অমেয় ব্যথায় তিনি মহাশক্তি বিশ্বজননীর উদ্দেশ্যে গর্জে উঠতেন, মা, মা, একি তোর একচোখো লীলাখেলা!

তিনি দেখেছিলেন, আমেরিকায় গরীবের উপকারের জন্যে শত শত রকমের সেবাপ্রতিষ্ঠান আছে। মানুষের জন্যে মানুষের এই দরদী অনুরাগ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাছাড়া, এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র মূলত মানুষের সাম্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। এখানে জন্মের জন্যে কারোকে অনুশোচনা করতে হয় না। জীবনে বড় হবার,—উন্নতি করবার সুযোগ আছে সকলেরই। চিকাগো থেকে শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে তিনি লিখে ছিলেন ঃ

"যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নেই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, অপরচুনিটি আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দারিদ্র্যের সহায়তা করতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীদের মাসিক আয় দু টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীর, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করবার কটা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্যে প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ বলতে পার! তোমরা তাদের ছোঁওনা, দূর-দূর কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র, পদদলিত গরীবদের জন্য কি করেছেন? খালি বলছেন, ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। এমন

সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা।"*

আমেরিকায় আসার আগে গরীবদের সম্বন্ধে তাঁর ছিল শুধু সেবার মনোভাব—বলা যেতে পারে, মূলত তা সমাজের নীচুস্তরের মানুষকে উঁচুস্তরের সানুগ্রহ পৃষ্ঠ-পোষকতা। কিন্তু আমেরিক ডেমোক্রেসির আবেষ্টনে এসে তিনি সকল মানুষের সাম্যের ভিত্তিতে এই সমস্যাকে দেখতে শুরু করেছিলেন। গরীব যারা, সমাজের নীচু স্তরের দুর্গত যারা, আত্মবিকাশের অধিকার অপর সকলের মত তাদেরও আছে। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব এই ছিল যে, এই অধিকারতত্ত্বকে তিনি নিছক রাজনৈতিক ভিত্তি থেকে দেখেন নি, দেখতেন মানবিকতার আদি ভিত্তিভূমি থেকে। মান্দ্রাজী শিষ্যদের একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"বুদ্ধ থেকে শুরু করে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই জাতিভেদ প্রথাকে ধর্মবিধান বলে ভুল করেছিলেন। তাই জাতিপ্রথা ও ধর্ম দুইই ভাঙার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। অবশ্য কেউই সফল হতে পারেন নি। পুরুতরা যতই চেঁচান না কেন, জাতিভেদ একটা নির্দিষ্টভাবে-গড়ে-ওঠা সামাজিক ব্যবস্থা। তার কাজ শেষ করে এখন ভারতবর্ষের আকাশকে দুর্গন্ধে ভরে দিয়েছে। তা দূর হবে একমাত্র যদি জনসাধারণের মধ্যে লোপ-পাওয়া স্বাধিকার

* "পত্রাবলী," ১ম, পা ৪৫।

বোধকে আবার জাগানো যায়। এখানে যে জন্মায় সে-ই জানে, সে মানুষ। ভারতবর্ষে যে জন্মায় সে জানে, সে সমাজের গোলাম ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীনতাই আত্মবিকাশের একমাত্র উপাদান। স্বাধীনতা কেড়ে নাও, অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।" *

আমেরিকাবাসীদের দ্বিতীয় প্রভাব হচ্ছে, মেয়েদের উন্নতির জন্যে আত্মনিয়োগের সংকল্প। ভারতের স্বতন্ত্র-সত্তাহীন, সামাজিক অধিকারহীন, মেয়েদের দুঃখবেদনার সম্বন্ধে অবশ্য কোনদিনই তিনি উদাসীন ছিলেন না। আমাদের আধুনিক সমাজবিকাশের সাধনায় ব্রাহ্মসমাজের একটি প্রধান দান, মেয়েদের উন্নতির জন্যে আন্তরিক চেষ্টা। বিবেকানন্দ যৌবনে তার প্রভাবে এসেছিলেন—স্বভাবতই এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ থাকা সম্ভব। তা ছাড়া কি দুঃসহ বেদনার মধ্যে হিন্দুমেয়েদের জীবন কাটে তার অভিজ্ঞতা স্বামীজির জীবনে বারবার ঘটেছিল। বিবাহিত জীবনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁর এক বোন আত্মহত্যা করেছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় যখন তিনি আলমোড়ায় ছিলেন, তখন এই নিদারুণ খবর পেয়ে তাঁর খুবই আঘাত লেগেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে থাকার সময়ে মেয়েদের উন্নতির জন্যে কোন সংঘবদ্ধ কাজ করার সংকল্প কখনো তাঁর মনে জাগেনি। আমেরিকায় এসে মেয়েদের তিনি দেখেছিলেন নতুন রূপে। আশ্চর্য এই যে, রমণীর

* "এপিসিল্‌স্‌," ১ম, পা ২৬।

সংসর্গে আসতে হিন্দুসন্ন্যাসীরা সাধারণত কুণ্ঠিত হন। কিন্তু আমেরিকায় বিবেকানন্দের সিদ্ধির প্রধান বাহন ছিলেন তাঁরাই। ইংলণ্ড তাঁর কর্মব্রতে দাম করেছিল মেয়ের চেয়ে পুরুষ বেশি। কিন্তু আমেরিকার অর্ঘ্যে ছিল দু-চার জন ছাড়া প্রায় সবই শিষ্যার দল। তাঁদের সম্বন্ধে বিবেকানন্দের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। বিদেশ থেকে লেখা চিঠিগুলির পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে সেই শ্রদ্ধা ঃ

"বাবাজি শাক্ত মানের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ-ভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে; এবং মনু মহারাজ বলেছেন যে 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

"আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসরি—সব কাজ করে অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত্র গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ বৎসরের বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ বাবাজি?"

আমেরিকা ও ইউরোপে তাঁর কাটে প্রায় সাড়ে তিন বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি ভারতবর্ষের কার্যধারার সম্বন্ধে শুধু চিন্তাই করেন নি, সেই শত যোজন দূর থেকে কাজ শুরু করার প্রাথমিক আয়োজন প্রায় শেষ করে-ছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে অবশ্য মেয়েদের উন্নতিকল্পে কি ভাবে কাজ করবেন, তা ঠিক করেন নি। কিন্তু জনসাধারণের সম্বন্ধে কাজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আমেরিকাবাসের প্রথম দিকেই স্থির করে ফেলেছিলেন। মান্দ্রাজের শিষ্যদের এবং আলম-বাজারের গুরুভাইদের কাছে চিঠি লিখে তিনি বারবার নির্দেশ দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন। সেই সব চিঠিতে শুধু তাঁর বিস্তৃত পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া যায় না, তার মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর হৃদয়ের স্পষ্ট ছবি। চিঠির মধ্যে তিনি ঢেলে দিতেন তাঁর মনপ্রাণকে। একখানা চিঠিতে আছে ঃ

"সমাজে জাতের বিচার থাকবে কি যাবে—এ সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমার লক্ষ্য হচ্ছে এই যে ভারত-বর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে সমস্ত মানুষ গোষ্ঠীর চেষ্টায় যে সব উদার ভাবধারা বিকশিত হয়ে উঠেছে, তা সবার নীচে যারা পড়ে আছে সেই সবহারাদের ঘরে ঘরে বিলোতে হবে। জাতবিচার থাকা উচিত কিনা—মেয়েরা পুরো স্বাধীনতা পাবে কি পাবে না—এ সব সমস্যার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের বেঁচে

থাকার আর কল্যাণের পথে বিকাশের জন্যে একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা। যে দেশে তা নেই সেখানে মানুষ, গোষ্ঠী বা জাতি সব কিছুরই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। * * * আমার জীবনের একমাত্র আদর্শ এমন একটা আন্দোলন জাগিয়ে তোলা যার ফলে ঘরে ঘরে সেই মহা ভাবধারা ছড়িয়ে পড়বে। তারপর মেয়ে ও পুরুষেরা নিজেদের জীবনের সমস্যা নিজেরা সমাধান করে নেবে। তারা জানুক, আমাদের এবং অপর অপর জাতের পূর্বপুরুষেরা জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে কি ভাবতেন। বিশেষতঃ তারা চোখ চেয়ে দেখুক, অপরে এখন কি করছে। তারপর বিচার করে সব সমস্যার সমাধান করুক।" *

"এখন আমাদের সমস্যা এই। স্বাধীনতা ছাড়া কোন বিকাশ হতে পারে না। আমাদের পূর্ববর্তীরা ধর্মজগতে চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, ফলে আমরা পেয়েছি এক অপূর্ব ধর্ম। কিন্তু তাঁরা সমাজের পায়ে কড়া শেকল পরিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে আমাদের সমাজ আজ হয়ে পড়েছে যাকে এক কথায় বলা যায় ভয়ঙ্কর নরকের মত। পাশ্চাত্যে সমাজজীবনের ছিল স্বাধীনতা, আজ তার ফল কি হয়েছে তাদের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখ। অন্যদিকে তাদের ধর্মের দশা সম্পূর্ণ আলাদা। * * * আমরা বোকার মত বস্তুগত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করি। এ যেন 'আঙুর ফল টক'। এমন কি তর্কের খাতিরে ও সব বাজে কথা মেনে নিলেও, ধরা যাক সারা ভারতে এক হাজার সত্যিকার আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন নরনারী আছেন। কিন্তু এই ক'জনের

* "এপিসিল্‌স্‌", ১ম, পা ৩৪।

আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্যে ত্রিশ কোটি লোক অনাহারে বুনো মানুষের মত জীবন কাটাবে ?" *

তারপর এই চিঠিতেই প্রাণের জ্বালায় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সেকালের ভারতবাসীর কানে বেদান্তের বিরুদ্ধে কি অদ্ভুত বিদ্রোহবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

"* * * গরীবরা যাতে জীবিকার জন্যে কাজ পায় তার জন্যে চাই শুধু বস্তুগত সংস্কৃতি নয়—এমন কি বিলাসিতাও। রুটি চাই রুটি। যে ভগবান ইহলোকে আমাকে রুটি যোগাতে পারেন না তিনি দেবেন স্বর্গে অনন্ত সুখ—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। রেখে দাও তোমার ভগবান ! ভারতবর্ষের উন্নতি করতে হবে। গরীবের মুখে দিতে হবে অন্ন, ছড়িয়ে দিতে হবে শিক্ষা, পুরুত-তন্ত্রের অরাজকতা করতে হবে দূর।"

ভারতের মেরুদণ্ডহীন, বিরাট মনুষ্যত্বের তাল দিয়ে কি আদর্শে মহাজাতি গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখতেন তা কয়েক পঙ্‌ক্তিতে বড় চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"Can you become an occidental of occidentals in your spirit of equality, freedom, work and energy, and at the same time a Hindu to the very backbone in religious culture and instincts." †

* "এপিসিল্‌স্" ১ম, পা ৩৫।

† এপিসিলস্ ১ম পা ৬০।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে এসে পৌঁছলেন। এবার লণ্ডনে কেন্দ্র করে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। দলে দলে নরনারী তাঁর কাছে আসতে শুরু করে দিলেন। পিকাডিলি পিকচার গ্যালারি, প্রিন্সেস হল প্রভৃতি নানা সমিতিগৃহে এবং বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে তিনি বেদান্ত, ভক্তিযোগ, শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি বুঝেছিলেন, আমেরিকাবাসীর মত ইংরেজেরা নয়। আমেরিকাবাসীর সত্যসন্ধানে তীব্র আগ্রহ এবং আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কোথায় যেন তাদের চরিত্রে আছে একটা হাল্কা ভাব। ইংরেজদের প্রকৃতি আরো গভীর, সহজে তারা উদ্দীপ্ত হয় না। কিন্তু একবার হলে তাদের উৎসাহ অফুরন্ত। বাইরে থেকে দেখতে যেন আবেগহীন, কঠিন। কিন্তু বাইরের কাঠিন্যের তলে তলে আছে একটা কোমলতার গোপন স্রোত। সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে ফল অবশ্যম্ভাবী। তাঁর এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণ হয় নি। ইংলণ্ডে তিনি বেশিদিন কাজ করতে পারেন নি। কিন্তু সেই কম সময়ের মধ্যেই ইংলণ্ড রামকৃষ্ণবেদান্ত আন্দোলনে যে চারজন সন্তানকে দান করেছিল, রামকৃষ্ণমিশনেরর ইতিহাসে তাঁদের তুলনা বিরল। এমনি এক সাধারণ প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামীজির সঙ্গে দেখা হয় শ্রীমতী মার্গারেট নোবলএর। সন্ন্যাসী হবার পর তাঁর

নাম হয়েছিল সিষ্টার নিবেদিতা। তিনি গুরুর ব্রতে একদিনে নিজেকে উৎসর্গ করেন নি। অবশ্য প্রথম দিনই বক্তৃতা শোনবার পর তাঁর কথার নূতনত্বে নিবেদিতা অভিভূত হন। কিন্তু দিনের পর দিন স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হলে তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছেন,—তাঁর বক্তব্য স্বীকার করেও সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করতে পারেন নি। তাঁর দ্বিধার আর শেষ নেই—মনের কিন্তু নিয়ে বার বার বাড়ী ফিরে আসেন। এদিকে স্বামীজিকে ভুলতেও পারেন না—তাঁর বক্তৃতা কানে রাতদিন গুণগুণ করতে থাকে। তিনি ছিলেন এক বিদ্যালয়ের তরুণী প্রধান শিক্ষয়িত্রী। বয়েস সাতাশ আটাশ। বিয়ে করেন নি। শেষে একদিন তাঁর সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল—তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন বিশ্ব-মানবের এই নব জাগরণের আন্দোলনে। স্বামীজির সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে আসেন, ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নেন। হিন্দুস্থানের সন্ন্যাসীদের মঠে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য ব্রহ্মচারিণী। গুরুর কাজের জন্য আচারে ব্যবহারে, চিন্তায় কল্পনায় তিনি পুরোপুরি নিজেকে হিন্দু করে গড়ে তুলেছিলেন। বিবেকানন্দ জানতেন, সনাতনপন্থী ভারতবর্ষের হৃদয় জয় করার এ ছাড়া অন্য গতি ছিল না। তিনি শুধু পাশ্চাত্য শিষ্যদের নয়, ভারতীয় শিষ্যদেরও উদ্দেশ্যে বার বার এ কথা বলতেন, যাদের সেবা করতে চাও, তাদের সঙ্গে কোন আড়াল না রেখে মিশে যাও। তাদের সব কিছুকে

ভালবাস। তাদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দাও। তুমি তাদের চেয়ে বড়, তাদের উপকার করতে এসেছ, এই ধারণা নিয়ে গেলে প্রকৃত সেবা করা যায় না। মানুষের সেবা করলে তাদের উপকার হবে না—হবে তোমার নিজের উপকার। নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা কর। গুরুর কাছ থেকে নব ভারতের মেয়েদের শিক্ষাভার পেয়ে এই ইংরেজ তরুণী তাঁর সব কিছু উৎসর্গ করেছিলেন—এমন কি পার-হয়ে-আসা অতীত জীবনের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মন থেকে মুছে দিয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত গুডউইনএর কথা তো আগেই বলা হয়েছে। স্বামীজির সঙ্গে যখন দেখা হয়, এঁরা দুজনেই ছিলেন বয়সে তরুণ। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যখন স্বামীজির দেখা হয় তখন তাঁদের আর যৌবন ছিল না। সেভিয়ারের বয়স উনপঞ্চাশ। ধর্মপথে মতি দুজনেরই আগে থেকে ছিল। একটি বক্তৃতাসভা শেষ হলে বাইরে বেরিয়ে এসে শ্রীযুক্ত সেভিয়ার শ্রীমতী ম্যাকলিয়ডকে দেখতে পেলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে নতুন বাণীর সন্ধান পেয়েছেন তিনি—মনে জেগেছে চাঞ্চল্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই যুবককে আপনি জানেন? ওঁকে দেখে যা মনে হয় সত্যিই কি উনি তাই?

স্বামীজির গুণমুগ্ধ আমেরিকান বান্ধবী শ্রীমতী ম্যাকলিয়ড বললেন, হ্যাঁ, তা-ই। ভণ্ডামি ওঁর মধ্যে তিলমাত্র নেই।

জবাব এল, তাহলে তো লোকের উচিত ওঁর অনুসরণ করে ভগবান লাভের জন্যে সাধনা করা।

শ্রীযুক্ত সেভিয়ার বাড়ী এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি স্বামীজির শিষ্য হতে চাই, তোমার আপত্তি আছে ?

প্রবীণ প্রবীণা নবীনের কাছে নিজেদের সঁপে দিলেন। তাঁদের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে যে টাকা হল সেই টাকা স্বামীজির কাজে দান করবার সংকল্প করলেন। স্বামীজিকে তাঁরা সন্তানের মত দেখতেন।

ইউরোপে তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন তাঁকে কাছ ছাড়া করেন নি। তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে নিজেদের টাকায় আলমোড়া জেলায় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম তাঁরাই গড়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে এসে দেশের সঙ্গে তাঁরা আর কোন সম্পর্ক রাখেন নি। স্বামীজির দেশই তাঁদের দেশ, —তাঁদের সাধনার পীঠস্থান। স্বামীজির দেওয়া কাজের ভারই ছিল তাঁদের জীবনের পরম ব্রত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেভিয়ার আলমোড়ায় দেহ রাখেন। তারপরে শ্রীমতী সেভিয়ারএর দীর্ঘ দিন কাটে একাকী সেই পার্বত্য আশ্রমেই। একবার শ্রীমতী ম্যাকলিয়ড তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এমনি ভাবে একঘেয়ে এখানে থেকে আপনার বিরক্তি জাগে না ?

শ্রীমতী সেভিয়ার নিঃশব্দে জবাব দিয়েছিলেন, আমি শুধু স্বামীজির কথা ভাবি। তাঁর স্মৃতিই আমার ধ্যান— আমার সঙ্গের সাথী।

ইংলণ্ডে এবং পরে ইউরোপে ভ্রমণের সময় অনেক ইউরোপীয় মনীষীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের শ্রীযুক্ত ম্যাক্সমূলর এবং জার্মানীর শ্রীযুক্ত পল ডয়সনএর * নাম উল্লেখযোগ্য।

এদিকে অবিশ্রাম পরিশ্রমে স্বামীজির শরীর ভেঙে পড়ছিল। ক্রমে অবসাদ তাঁর দেহের রেখায় রেখায় ফুটে উঠল। আমেরিকাতেই তাঁর অটুট স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছিল। এখানে কাজের চাপে আরো খারাপ হয়ে গেল। সেভিয়ারেরা তাঁকে বিশ্রামের জন্যে ইউরোপ ভ্রমণে নিয়ে গেলেন। ইউরোপ থেকে কতকটা সুস্থ হয়ে তিনি দুমাসের জন্যে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। তারপর হঠাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর দেশের দিকে রওনা হন। সঙ্গে রইলেন সেভিয়ারেরা স্বামী স্ত্রী আর গুডউইন। ইংলণ্ডের কাজের হিসেব নিতে গিয়ে তিনি আমেরিকার চেয়ে বেশি খুশী হয়েছিলেন। এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমার আমেরিকার কাজের চেয়ে ইংলণ্ডের কাজ আমার কাছে বেশি‡আশাপ্রদ।

‡ "হিন্দুধর্মের নবজাগরণ"

মার কোলে

ভারতবর্ষে এসে খবর পৌছল, স্বামীজি দেশে ফিরে আসছেন। দিকে দিকে বিদ্যুৎগতিতে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। জাতির একান্ত সাধনার ধন পৃথিবীর হৃদয় জয় করে ফিরে আসছেন। তাঁকে ঘরে বরণ করে নিতে হবে—কে সব চেয়ে আগে সবচেয়ে বেশি অর্ঘ্যদান করবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। গত সাড়ে তিন বছর ভারতবর্ষে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করার জন্যে দূর থেকে তিনি ভাব প্রচার করছিলেন কিন্তু প্রাচীন জাতির চিত্তে যে কি বিপুল সাড়া জাগিয়েছিলেন তা তাঁর ধারণা ছিল না। রামের অনুচরের মত তিনি স্বর্ণলঙ্কায় বন্দিনী আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কাছে বহন করে নিয়ে গেছলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে মুক্তির বাণী। তাঁর সাগর-পারের সেই জয়যাত্রা যে ভারতবর্ষের দেহে মনে কি মুক্তির আস্বাদ এনে দিয়েছিল তা তিনি জানতেন না। হিন্দুজাতির ভাঙা ঘরে তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন নিবে-যাওয়া মাটির

প্রদীপ। শুকিয়ে-যাওয়া লতার বুকে জেগে উঠেছিল প্রথম মুকুল। অন্ধকার বনভূমি ভরে উঠেছিল পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভেসে-ওঠা আশার আলোয়। মরা প্রাণের একেবারে উৎসমূলে তিনি পুরে দিয়েছিলেন বাঁচার নিশ্বাস। ভারতের আঙিনা ছেয়ে গেচল নতুন সুরের রাগিণীতে। হাল আমলে আর কখনো এমন করে শাক্তবৈষ্ণব, ভক্তি-বাদী বৈদান্তিক, সংসারী সন্ন্যাসী, ধনী গরীব এক সঙ্গে মেলে নি। রাজা অশোকের পর সারা হিন্দুজাতি আর কখনো নিজেদের অবিচ্ছিন্ন ঐক্য এমন নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে নি। তিনি একে একে কলম্বো, কাণ্ডি, পাম্বান, মদুরা, মান্দ্রাজ হয়ে কলকাতায় পৌঁছলেন। সারা দেশ মাথা নত করে চিৎকার করে উঠল, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় বিবেকানন্দ। সেদিন সর্বত্যাগী পথের ভিখারীকে ভারতবাসী দিয়েছিল সেই সম্মান যে সম্মান প্রাচীন রোমক জাতির কাছ থেকে পেতেন তাঁদের দ্বিগ্বিজয়ী প্রবলপ্রতাপ সম্রাট। অবশ্য স্বামীজির সম্মানের দাম ছিল আরো বেশি। সম্রাটের সম্মানে আসত কর্তব্যের সাড়া, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ছিল হৃদয়ের প্রেরণা। একজনের অভ্যর্থনার মূলে হয়ত হৃদয়ে হৃদয়ে লুকিয়ে থাকত লাভের প্রত্যাশা। আর একজনের অভিনন্দনআয়োজনে ছিল শুধু দেবার কৃতজ্ঞ আকাঙ্ক্ষা। মান্দ্রাজ ও কলকাতার পথে পথে তৈরি হয়েছিল তোরণের পর তোরণ—ঘরে ঘরে উৎসব

সজ্জা। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে তাঁর জয় ধ্বনিত হয়েছিল। শোভাযাত্রার সময়ে বাড়ীর পর বাড়ীর জানলা থেকে হয়েছিল পুষ্পবৃষ্টি। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজা রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারের প্রাসাদে অভিনন্দন সভায় প্রায় পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। স্বামীজির কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল সারা জাতির সেই বিরাট উদ্দীপনার উপযোগী বজ্রনির্ঘোষ। অবশ্য কলকাতার বক্তৃতাগুলোতে ছিল ঘরোয়া অন্তরঙ্গতার স্থর, ঘরের ছেলে যেন বাড়ী ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞতা ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করছেন। মান্দ্রাজেই তিনি প্রাণ-স্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিলেন ভারতবর্ষে কি ভাবে কাজ করতে চান সেই কথা। তিনি বলেছিলেন ঃ

"Aye, let every man and woman and child without respect of caste or birth, weakness or strength, hear and learn that behind the strong and the weak, behind the high and the low, behind everyone, there is that Infinite Soul, assuring the infinite possibility and the infinite capacity of all to become great and good. Let us proclaim to every soul : Arise, awake, and sleep not till the goal is reached. Arise, awake! Awake from this hypnotism of weakness, omnipotent, and omniscient. Stand

up, assert yourself, proclaim the God within you, do not deny Him ! * * * ” †

“It is a man-making religion that we want. It is man-making education all round that we want. * * * *

“Therefore my plan is to start institutions in India to train our young men as preachers of the truths of our scriptures in India and outside India. Men, men, these are wanted : everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. A hundred such and the world becomes revolutionised. The will is stronger than anything else. Everything must go down before the will, for that comes from God.” †

*
* *

অভিনন্দনের পালা শেষ হলে ভারতে জনগণের জন্য শিক্ষা ও সেবা এবং বাইরে বেদান্ত প্রচার এই দুই ব্রতের ব্যবস্থা তিনি করতে লাগলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা এল তাঁর গুরুভাইদের কাছ থেকে। এই বিদ্রোহী পুরুষ-সিংহের মতে প্রথমে তাঁরা সকলে মত দিতে পারেন নি। সন্ন্যাসীর লক্ষ্য তো ব্যক্তিগত মুক্তি। সকল বন্ধনের পারে

† “দি মিশান অব্ দি বেদান্ত” † “মাই প্লান অব ক্যামপেন”

যাওয়াই তাঁদের কাম্য। কাজের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাঁদের ধ্যানধারণা সাধনভজনের বিঘ্ন হবে যে। শান্তির জীবনে টেনে নিয়ে আসবেন যত অশান্তির জঞ্জাল! বাঁধন-হীন জীবনকে দুর্ভর করে তুলবেন নিজহাতে কাজের শৃঙ্খল রচনা করে। ভারতের সন্ন্যাসী কখনো এমন কথা ভাবতে পারেন! অদ্বৈতবাদী, কর্মযোগী গর্জে উঠলেন, বাঁধন দিয়েই বাঁধন কাটার সাধনা তাদের। সন্ন্যাসী,—যারা সব আশা ত্যাগ করেছে, তাদের আবার শান্তিমুক্তির দরকার কি? সব যখন ত্যাগ করেছ, শান্তির ইচ্ছা মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও। মানুষের প্রেমে আত্মহারা পাগল সন্ন্যাসী বললেন: "যদি ভাল চাও তো ঘণ্টা ফণ্টা গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মানব দেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম—ঘণ্টার ওপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশীবৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁঠকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জেন্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাঁসপাতাল বানাচ্ছে—

মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নেই যে, এ কথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহাব্যারাম—পাগলা গারদ, দেশ নয়। * * * তোরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার কর—যা আমাদের দেশে কখনো হয় নি।" *

বিবেকানন্দের গুরুভাইরা শুনলেন কিন্তু—। মন থেকে এই কিন্তু যে গিয়েও যেতে চায় না। অবশেষে বুদ্ধি দিয়ে যে দ্বন্দ্বের শেষ হল না ভালবাসায় তা চাপা পড়ল। নরেনের কথাই যে ঠাকুরের আদেশ। নরেন ছাড়া তাঁদের আর জীবনে আপন ধন কি আছে! তাঁরা মজলেন, মুক্তিত্যাগী সন্ন্যাসীর নবমুক্তিব্রতে তাঁরা নিজেদের সঁপে দিলেন।

এর আগেই স্বামীজির আদেশে সারদানন্দ গেছলেন আমেরিকায় আর অভেদানন্দ ইংলণ্ডে। এখন তিনি ভারতবর্ষের দিকে দিকে অপরদের পাঠাতে লাগলেন। যিনি রামকৃষ্ণদেবের ভস্মদান ছেড়ে কোনদিন কোন তীর্থে পর্যন্ত যান নি সেই শশীমহারাজ গেলেন মান্দ্রাজে কেন্দ্রস্থাপন করতে আর শিবানন্দ সিংহলে। বিবেকানন্দের কর্মব্রতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে গিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবার আয়োজন করলেন।

এদিকে কাজের ভিড়ে আর কলকাতার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় স্বামীজির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। স্বাস্থ্যের

*"পত্রাবলী" ২য়, পা ৯২।

আশায় তিনি কিছুদিন দার্জিলিং আর আলমোড়ায় কাটিয়ে এলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁর কাজ যে এখনো অনেক বাকি! এ সময় কি বিশ্রামের অবসর তাঁর আছে? কলকাতায় তিনি থাকতেন হয় আলমবাজারের মঠে না-হয় শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়ীতে। এই বাড়ীতেই পরমহংসদেবের সমস্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের এক সভায় ডেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১ মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর আদর্শ ব্যাখ্যা করে প্রথমে তিনি বক্তৃতা দিলেন। মিশনের লক্ষ্য স্থির হল, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সব সত্য জীবনে পালন করে জগতের মঙ্গলের জন্য প্রচার করে গেছেন তাই প্রচার করা এবং ঐহিক ও পারমার্থিক কল্যাণের আশায় সেই সব তত্ত্ব জীবনে পালন করবার জন্য জনসাধারণকে সাহায্য করা।

মিশনের কাজ শুরু হল। কিন্তু গুরুভাইদের মনের দ্বন্দ্ব তখনো শেষ হয় নি। একদিন কলকাতা কেন্দ্রের সহসভাপতি স্বামী যোগানন্দ কথায় কথায় বললেন, সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, সংঘ করে লোকের উপকার করব এ রকম অহঙ্কার করা—এ সব বিদেশী ভাব। ঠাকুরের উপদেশ কি এ রকম ছিল?

স্বামীজি জবাব দিলেন, তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডীতে বেঁধে রাখতে চাস? তা হবে না।

আমি এ গণ্ডী ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। দেখ, ঠাকুরের কৃপার পরিচয় এ জীবনে বারবার পেয়েছি। স্পষ্ট অনুভব করছি, তিনিই আমার পিছনে দাঁড়িয়ে এ সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

—তোমার ইচ্ছানুযায়ীই তো আমরা চিরদিন চলে আসছি। যোগানন্দ স্বামীর জবাবে সমস্ত গুরুভাইদের গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছিল : জানি, তোমার ইচ্ছাই ঠাকুরের ইচ্ছা। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে যে খটকা লাগে তাই তোমাকে আমাদের সন্দেহ খুলে বলি।

—কথাটা কি জানিস ? স্বামীজি বলতে লাগলেন : সাধারণ ভক্তেরা তাঁকে যতটুকু বুঝেচে তিনি সত্যিসত্যি ততটুকু নন। তাঁর লীলা অদ্ভুত, ভাব অসংখ্য। তাঁকে বোঝবার যো নেই। তাঁর উপমা তিনিই। তিনি মনে করলে কটাক্ষে লক্ষ বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তবু যদি আমাকে দিয়েই তাঁর কাজ করিয়ে নিতে চান তবে আমি কি করব বল ?

কিছুদিন পরে এ বিষয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাসি তামাসা করছেন, হঠাৎ একজন গম্ভীর হয়ে বললেন, কাজের পথ কিছুতেই পরমহংসদেবের পথ নয়। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবকে প্রচার না করে কর্মযোগের যে চেষ্টা করছেন, তা ভুল পথ।

স্বামীজি খুব হাল্কা মেজাজে ছিলেন। তাই প্রথমে

ব্যঙ্গ করে জবাব দিলেন, তুই কি জানিস ? তুই তো ঘোর মুখখু। যেমন গুরু তেমনি চেলা। প্রহ্লাদের মতন 'ক' দেখেই কেষ্ট বলে কেঁদে সারা। তোরা ধর্মের কি বুঝিস ? কচি ছেলের মত শুধু নাকে কেঁদে বলতে পারিস, ঠাকুর তোমার কি সুন্দর নাক, কিবে চোখ! মনে করেছিস্, এতেই তোদের মুক্তি আসবে হাতের মধ্যে। শেষদিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে তোমাদের একেবারেই বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবেন। আর জ্ঞানের চর্চা করতে লোকশিক্ষা দেওয়া, অনাথ আতুরদের সেবা করা এ সব মায়া—কেন না পরমহংসদেব এ সব করেন নি। আবার কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, আগে ভগবান পা, তারপর ও সব করিস। যেন ভগবানকে জানা মুখের কথা! তিনি যত নপুংসকদের হাতের খেলনা কিনা!

বলতে বলতে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। মনের বেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর রুদ্র মূর্তির রেখায় রেখায়। সিংহের মত তিনি গর্জে উঠলেন, তোমরা মনে করেছ যে তোমরাই তাঁকে বুঝতে পেরেছ আর আমি কিছুই পারি নি। তোমরা ভাব, জ্ঞানটা শুকনো জিনিস। তার চর্চা করতে গেলে মনের কোমল ভাবগুলোকে গলা টিপে মারতে হয়। যাও যাও কে তোমাদের রামকৃষ্ণকে চায় ? কে চায় তোমাদের ভক্তিমুক্তি ? কে দেখতে চায় তোমাদের শাস্ত্রে কি লেখা আছে ? আমার দেশের লোকের

যদি তমোনিদ্রা ঘুচিয়ে দিতে পারি, যদি তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে কর্মযোগে অনুপ্রাণিত করে গড়ে তুলতে পারি, আমি হাজার বার হাসতে হাসতে নরকে যেতে রাজি আছি। রামকৃষ্ণ টামকৃষ্ণ কারোর ভক্ত নই। আমি শুধু তার দাস যে নিজের ভক্তি মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে সদাই প্রস্তুত।

উত্তেজনার আবেগে তাঁর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল—গলার স্বর ভেঙে গেল। সমস্ত শরীর ঘন ঘন কাঁপতে লাগল। নিজেকে আর চেপে রাখতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর সামনে যেতে কারো সাহস হল না। খানিকক্ষণ পরে অতি সন্তর্পণে দু-একজন ঘরের কাছে গিয়ে দেখলেন, স্বামীজি নিশ্চলভাবে ধ্যানে বসে আছেন আর তাঁর গাল বেয়ে অবিরল চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তিনি বাইরে বেরিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আবার সকলের কাছে এসে বসলেন। মুখ তাঁর শান্ত, গম্ভীর। যেন মনে হয়, মনের গোপন কোণে একটা ভয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গেছে। কারো মুখে কথা নেই। শেষে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, মানুষের মন যখন ভক্তিতে ভরে ওঠে তখন তার হৃদয় আর স্নায়ুগুলো এত নরম হয়ে পড়ে যে ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জান যে আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেম কাহিনী পর্যন্ত পড়তে

পারি না? ঠাকুরের কথা বেশিক্ষণ বললে বা ভাবলে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ি। তাইতো কেবলি আমার মধ্যে উপছে-ওঠা ভক্তিস্রোতকে চাপতে চেষ্টা করছি। কেবলই চাইছি জ্ঞানের শক্ত শেকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে। এখনো দেশে আমার অনেক কাজ বাকি। ঠাকুরের দাসানুদাস আমি। আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই। কত ভালই না তিনি আমাকে বাসতেন।

যেমনি গুরু, তেমনি শিষ্য। বাংলাদেশের পুণ্যভূমিতে এসে মিশেছিল আকাশ আর সমুদ্র। এককে বুঝতে হয় আর একের বিরাট বুকে তার ছায়া-পড়া মূর্তি দেখে।

এই ঘটনার পর থেকে আর কখনো কেউ তাঁর কাজে সংশয় প্রকাশ করেন নি। মানুষ মাত্রেরই জন্যে কি অফুরন্ত প্রেম না তাঁর হৃদয়ে ছিল। তিনি নিজের সম্বন্ধে বড় সত্যি কথা একদিন বলেছিলেন, পরমহংসদেব বাইরে ছিলেন ভক্ত,—ভেতরে জ্ঞানী। আর তাঁর ঠিক উল্টো। তাঁর বাইরে ছিল জ্ঞানের আবরণ ভেতরে নিত্যউচ্ছসিত ভক্তির সমুদ্র। একদিনের ঘটনায় তা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল। বিবেকানন্দের চরিত্র জটিল—নানা বিপরীত উপাদানে তা গড়ে উঠেছিল—নানা বিপরীত বস্তুর আশ্রয়ও তাতে মিলত। একাধারে তিনি ছিলেন জ্ঞানমার্গী এবং ভক্তিপন্থী অদ্বৈতবাদী, এবং সমাজসংস্কারক, কর্মযোগী এবং

বৈরাগী, শিল্পী এবং সাংসারিক কার্যকুশলী, নূতনের বিদ্রোহী কর্মী এবং প্রাচীনের মুগ্ধ ভক্ত,—বিচার এবং বিশ্বাস দু পথেই ছিল তাঁর অনুরাগ। কিন্তু ভারতবর্ষের কর্মক্ষেত্রে তিনি শেষপর্যন্ত অদ্বৈত সাধনা ছেড়ে নরনারায়ণের সেবক হিসাবেই জীবন কাটিয়ে গেছেন।

সেদিন এক শিষ্যের সঙ্গে সায়নের ভাষ্য সমেত বেদ পাঠ ও আলোচনা হচ্ছিল। স্বামীজি মাঝে মাঝে কূট তর্কের অবতারণা করে সায়নাচার্যের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করছিলেন। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, যেন জ্ঞানমার্গী শঙ্করাচার্য নেমে এসেছেন। তর্ক আর বিচার ছাড়া বুঝি তাঁর জীবনে আর কোন কাম্য নেই। এমন সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এসে হাজির হলেন। কথায় কথায় স্বামীজি তাঁকে মৃদু ব্যঙ্গ করে বললেন, জি, সি, তুমি তো এসব কিছুই পড়লে না। শুধু কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।

গিরিশবাবু জবাব দিলেন, আমার আর ও সব পড়ে কি হবে ভাই? আমি দূর থেকে বেদবেদান্তকে নমস্কার করে ঠাকুরকে স্মরণ করতে করতেই পাড়ি দেব। তোমাকে দিয়ে তাঁর লোকশিক্ষা দেবার দরকার ছিল, তাই তোমাকে ও সব পড়তে হয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে হঠাৎ গিরিশচন্দ্র শুরু করলেন, আচ্ছা, নরেন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। বেদবেদান্ত তো তুমি ঢের পড়লে কিন্তু বলত, তাতে দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর

আর্তনাদ, ব্যভিচারাদি পাপস্রোত দূর করার কোন ব্যবস্থা আছে কি ? রোজই তো শুনি, ঐ অমুক বাড়ীর গিন্নি—যার বাড়ীতে এককালে প্রত্যহ চল্লিশ পঞ্চাশখানা পাত পড়ত, আজ তিনদিন তার হাঁড়ি চড়ে নি,—অমুক বাড়ীর এক অনাথা কুলস্ত্রীকে শয়তানদের অত্যাচারে প্রাণ হারাতে হয়েছে, অমুক বাড়ীর একজন যুবতী বিধবা কলঙ্ক গোপনের জন্যে ভ্রূণহত্যা করেছে, অমুক জোচ্চুরি করে অনাথা বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে। বলত, এ সব রহিত করার কোন উপায় কি বেদবেদান্তে—

গিরিশবাবুর অসমাপ্ত কথা শুনতে শুনতে স্বামীজির সারা অঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। জ্ঞানীর কঠিন আবরণ ভেদ করে আবেগের রেখা ফুটে উঠল। বেদনায় তাঁর বাক্‌শক্তি বিকল হয়ে গেল—কিছুক্ষণ তিনি নিস্পন্দের মত বসে রইলেন। তারপর দু-চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল অবিরল ধারে।

কর্মী বিবেকানন্দের চরিত্রের এই ছিল মূল বৈশিষ্ট্য। ভারতের জনসাধারণের দুর্গতি দূর করার জন্যে তিনি যে চেষ্টা করেছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে সুলভ না হলেও দুর্লভ নয়। যুগে যুগে সকল দেশেই গরীব, নীচ, নিপীড়িতদের সেবার জন্যে কর্মীশ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। শুধু ধর্মজগতে নয়, সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ রকম জনহিতকর আন্দোলনের অভাব নেই। সকল

অধঃপতিত জাতির নবজাগরণের গোড়ার ইতিহাস তো একই। কিন্তু বিবেকানন্দের মত বিরাট মানবিকতা বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে দুর্লভ। আভিজাত্যের আবেষ্টনে পালিত হয়েও সমাজের নীচু স্তরের মানুষের দুর্গতির জন্য এমনভাবে আর কোন মুক্তিকামী সন্ন্যাসীর প্রাণ কেঁদেছে কি না সন্দেহ। তাঁর অন্তরের এই বেদনার তুলনা নেই। এই বেদনা তাঁকে করে তুলেছিল পাগল। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই বেদনা পুষে রেখে তিনি যেমন শান্তি পান নি তেমনি সেই জ্বালা অগ্নি আখরে ছড়িয়ে দিয়ে গেছলেন সদ্য-জাগা ভারতের বুকে। তাঁর দেওয়া মন্ত্র আজো নব নবরূপে ভারতবর্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করে তুলছে। গান্ধীজির হরিজন আন্দোলন তো তাঁরই উদ্যমের পরিণত স্তর।

*
* *

স্বামীজি দাক্ষিণাত্য ঘুরে কলকাতায় এসেছিলেন। আর্যাবর্ত তখনো তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সুযোগ পায়নি। এখন বারবার নানা জায়গা থেকে সনির্বন্ধ উপরোধ আসতে লাগল। কিছুদিন আলমোড়ায় কাটিয়ে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি অম্বালা, অমৃতসহর, শ্রীনগর, মরি, রাওলপিণ্ডি, জম্মু, শিয়ালকোট, লাহোর, দেরাদুন, দিল্লী, আলোয়ার, জয়পুর, খেতড়ি প্রভৃতি জায়গায় প্রচার করে

বেড়ালেন। উত্তর ভারতে তিনি স্বামী দয়ানন্দের প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের সভ্যদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করেন। তাঁর মত শক্তি-উপাসক পুরুষসিংহ আর্যসমাজ আন্দোলনে সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন কিন্তু তিনি তাঁদের উগ্র গোঁড়ামির প্রশ্রয় কখনো দেন নি। অনেক আর্যসমাজী শিক্ষিত লোকেরা স্বামীজির অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর প্রভাবে লাহোর কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তীর্থরাম গোস্বামীর জীবনে এসে পৌঁছল অকস্মাৎ নতুন গ্রহের ডাক। বেদান্তপ্রচারে তিনি জীবন সঁপে দিলেন। তীর্থরাম গোস্বামী হলেন স্বামী রামতীর্থ। বিদায়ের দিনে তীর্থরাম স্মরণ চিহ্নহিসাবে স্বামীজিকে উপহার দিলেন তাঁর বহুমূল্য সোনার ঘড়িটি। সন্ন্যাসী হাসিমুখে সেই শ্রদ্ধার দান তুলে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে তীর্থরামের জামার পকেটের মধ্যে তা ফেলে দিয়ে বললেন, ঘড়িটি আমি আপনার পকেটে রেখেই ব্যবহার করব,—কি বলেন ?

কঠোর বৈদান্তিকের মন ছিল কচি পাতার মত তুলতুলে। রক্তের সম্পর্কে সকলকে ছেড়েও তিনি ঘরে ঘরে আত্মীয়তার বাঁধন কাটতে পারেন নি। আলোয়ারে এসে তাঁর মনে পড়ল, পরিব্রাজক অবস্থায় এখানকার এক গরীব বিধবা মহিলার অতিথি হয়েছিলেন। বিশ্বজয়ী মহাপুরুষ সেদিনের ঋণ ভোলেন নি। আলোয়ারে পৌঁছেই তিনি

সেই মহিলার কাছে খবর পাঠালেন, দুপুরে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মহিলার বাড়ীতে ভিক্ষা করতে আসবেন। তিনি যেন আগেকার মত চাপাটি তৈরি করে রাখেন। এই কথা শুনে গরীবের ঘরে আনন্দ ও বেদনার তড়িৎরেখা খেলে গেল। সাধুজি তাহলে গরীবদের অতিথিসৎকারের কথা ভোলেন নি কিন্তু আজ এত বড় মহাত্মাকে কি দিয়ে তাঁরা তুষ্ট করবেন! তাঁরা যে বড় গরীব! স্বামীজিকে খেতে বসিয়ে মহিলাটি মনের দুঃখ জানালেন বাবা, আমরা গরীব। তোমার যোগ্য সেবার জিনিস পাব কোথায়! ইচ্ছে থাকলেও মনের মত করে তোমায় খাওখাতে পারলুম না। আমাদের ত্রুটি নিও না।

ভোলানাথ মনের পূজা পেলেই তুষ্ট। পরম আনন্দে চাপাটি খেতে খেতে স্বামীজি বললেন, মা, তোমার দেওয়া এই চাপাটির মতন সাত্ত্বিক খাবার অনেক দিন খাইনি।

যাবার আগে মহিলাটির অজান্তে বিবেকানন্দ একখানি একশত টাকার নোট বাড়ীর একজন লোকের হাতে দিয়ে যান।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বেলুড় মঠের জন্য বিস্তৃত জমি কেনা হল। ইংরেজ শিষ্যা শ্রীমতী মূলার এর জন্যে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে। স্বামীজি তখন স্বাস্থ্যের আশায় দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। প্লেগের খবর শোনামাত্র

কলকাতায় ফিরে সেবাকাজ পরিচালনার ভার নিলেন। রামকৃষ্ণমিশনের কর্মীরা প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে রোগীদের সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু শুধু কর্মী দিয়েই তো কাজ হয় না। এত বড় সহরে কাজ চালাবার মত টাকা কই? স্বামীজি বলেছিলেন, ভয় কি? দরকার হলে মঠের নতুন-কেনা জমিজায়গা সব বেচে ফেল। আমরা সন্ন্যাসী, মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাব।

প্লেগের প্রকোপ কমলে তিনি প্রধানত পাশ্চাত্য শিষ্য-দের নিয়ে হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁদের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা। সিষ্টার নিবেদিতা, শ্রীমতী মূলার, ওলি বুল, ম্যাক্লিয়ড প্রভৃতি ভারতে এসে-ছিলেন স্বামীজির কাজে সাহায্য করার জন্যে। তিনি জানতেন, প্রথম দৃষ্টিতে ভারতকে ভুল বোঝা এই পাশ্চাত্য রমণীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাই আগে থেকেই ভারতের হৃদয়ের গোপন তলের সন্ধান যাতে তাঁরা পান সেই চেষ্টা তিনি করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—ওপরের আবরণ ছেড়ে ভিতরের প্রাণকে সন্ধান করতে শিখিয়েছিলেন। স্বামীজি তাঁদের শোনাতেন প্রাচীন ভারতের কাহিনী। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল—যা প্রাণহীন তাকে তিনি নিজের প্রাণের অনুরাগ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারতেন। গল্প করতে করতে বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের জীবন্ত

ছবি শিষ্যাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতেন। তার আচারব্যবহার, সংস্কারধারণা, দেবদেবী, অবতারসম্রাট, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়, সামাজিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দুর্গতি—কোন কথাই তিনি বাদ দিতেন না। তাঁর অগ্নিময় কথার স্রোতে যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠত তা ঠিক প্রাচীনও নয় আধুনিকও নয়। তা তাঁর নিজেরই-গড়া ভবিষ্যৎ ভারতভূমি—যার স্বপ্নে তাঁর মনপ্রাণ ভরেছিল। ঘুরে ফিরে বারবার তিনি শিষ্যাদের কানে এক কথাই শোনাতেন, সমালোচনা করো না, ভারতকে দেখ, তাকে ভালবাস। হৃদয়ে তাঁর ছিল অপরিসীম স্বদেশপ্রেম। দেশের কণামাত্র অগৌরব তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শ্রীমতী ম্যাকলিয়ড এদেশে আসার আগে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজি জবাব দিয়েছিলেন, যদি তুমি চারিদিকে দারিদ্র্য অধঃপতন, স্তূপাকার জঞ্জাল আর তার মধ্যে কানি-পরা মানুষের মুখে ভগবানের কথা শুনতে চাও তো এস। কিন্তু আর যদি কিছু চাও তো এস না। নিজেদের সম্বন্ধে সমালোচনা আমরা অনেক শুনেছি, আর শুনতে চাই না।

এদেশে এসে হিমালয় ভ্রমণের সময় একবার শ্রীমতী ম্যাকলিয়ড এক কিম্ভূৎকিমাকার ব্রাহ্মণকে দেখে হেসেছিলেন। সে হাসি চকিতে গিয়ে বেজেছিল স্বামীজির বুকে। তিনি গর্জে উঠেছিলেন, কি আমাদের জাতকে

তুমি বিদ্রূপ করছ? কে তুমি বিদ্রূপ করবার? কি তুমি আমাদের জন্যে করেছ?

এই ম্যাকলিয়ডই একবার স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্বামীজি কি ভাবে আমি আপনার কাজে সাহায্য করতে পারি, বলুন।

স্বদেশপ্রেমিক বৈদান্তিকের মুখ থেকে জবাব এসেছিল, ভারতবর্ষকে ভালবাস।

শিক্ষক হিসাবে বিবেকানন্দের খুব দূরদৃষ্টি ছিল। ভারতবর্ষকে বোঝবার পক্ষে পাশ্চাত্য নরনারীদের যে স্বাভাবিক বাধা আছে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এই ভ্রমণ উপলক্ষে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সহজে তাঁরা প্রাচীন হিন্দুজাতির অন্তরাত্মার সন্ধান পাবেন সেই শ্রদ্ধার দৃষ্টি দেবার জন্যে চেষ্টা করতেন। প্রথমে নাইনিতাল হয়ে তিনি আলমোড়া, রাওলপিণ্ডি, শ্রীনগর, ইসলামাবাদ, অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দেখে বেলুড়ে ফিরে আসেন।

আলমোড়ায় থাকতে থাকতে খবর পেলেন, গুডউইন আর নেই। ২রা জুন মান্দ্রাজে রক্তাতিসার রোগে মারা গেছেন। কিছুদিন আগে পওহারী বাবার তিরোধানের খবরও তাঁর কানে পৌঁছেছিল। প্রথমে কেউ গুডউইনএর মৃত্যুর নিদারুণ খবর তাঁকে দিতে সাহস করেন নি। শ্রীমতী বুলের বাংলোতে কথাপ্রসঙ্গে যখন জানতে পারলেন,

তিনি চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রহিলেন। তারপর উঠে চলে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে শিষ্যারা দেখা করতে এলে বলতে লাগলেন, তাঁর একটা ভয়ঙ্কর দুর্বলতা হয়েছে। গুডউইনের মূর্তিখানা কেবলই মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। এটা তো ভাল নয়। মাছ বা কুকুরের স্বভাব ত্যাগ করতে না পারা যেমন মানুষের পক্ষে অগৌরব, স্মৃতির দাস হওয়াও তেমনি। মানুষকে এ মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে—যারা চলে গেল, ঠিক ঠিক তো তারা চলে যায় নি, তারা তো আগের মত আমাদেরই আশে পাশে রয়েছে। বিচ্ছেদের কথা ভাবাই যে একটা মস্ত বড় ভুল। এ যেন শিষ্যাদের উপলক্ষ্য করে তাঁর নিজের মনকে নিজে বোঝানো। শোকার্ত বিদ্রোহী সান্ত্বনা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বললেন, কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে সংসার চলছে, এ কথা মনে করা কত আহাম্মকি। তা যদি হত, তাহলে গুডউইনকে মেরে ফেলার জন্যে এ রকম বিধাতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে মেরে ফেলাই কি উচিত হত না? ওঃ, গুডউইন বেঁচে থাকলে কত কাজই না করতে পারত!

এর পর মানুষের সংস্পর্শ স্বামীজির দুঃসহ মনে হতে লাগল। তিনি কাশ্মীরের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। এই যাত্রার শেষে অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীতীর্থে তাঁর হৃদয় শতদলের শেষ দলটি বিকশিত হয়। 'অপরূপ সে

দৃশ্য। হঠাৎ একদিন নির্জন পর্বতের বুকে দেখা গেল শত শত তাঁবু। বলাকার দল যেন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে। অমরনাথের গুহার পথে চলেছে যাত্রীদল। সন্ন্যাসী, সংসারী, পুরুষ, নারী—বিভিন্ন তাদের সাধনার পন্থা, বিভিন্ন তাদের রুচি কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে এক আকুল আকাঙ্ক্ষা। স্বামীজি চলেছেন তাদের সঙ্গে পূজার প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিধি অনুষ্ঠান নির্বিরোধে পালন করে। সঙ্গে নিবেদিতা।

২ আগষ্ট। ঝরণার হিমজলে স্নান করে স্বামীজি কাঁপতে কাঁপতে অমরনাথের গুহায় ঢুকলেন। গুহাটি প্রকাণ্ড। ঘন অন্ধকারের মধ্যে বিরাট তুষারবিগ্রহ। চারিদিকে স্তোত্রপাঠ আর মন্ত্রের গুঞ্জনধ্বনি। স্বামীজি কৌপীনধারী, সর্বাঙ্গে ছাই। তিনি সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন। ভক্তির উত্তেজনায় তাঁর সংজ্ঞা প্রায় লোপ পেয়ে গেছল। শিব, শিব—শিব! সহসা তিনি পেলেন এক পরম অনুভূতি। তাঁর হৃদয় ভরে দেখা দিয়েছেন অমরনাথ। কি অনুভূতি সেদিন পেয়েছিলেন, তা কখনো কারো কাছে ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর মুখে কেবল শিবনাম—গল্প কেবল মহেশ্বরের। আকাশে বাতাসে, কাছে দূরে, জড়ে অজড়ে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছেন শিব। শিবভাবে বিভোর হয়ে গেছলেন তিনি।

অমরনাথ থেকে ফিরে মাস খানেক পরে তাঁর মন আবার শিবভাবের বদলে শক্তিভাবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

এই সময় তাঁরা নৌকায় বাস করছিলেন। একদিন শিষ্যাদের বললেন, এখন যেদিকে চাইছি, কেবল দেখছি মাকে। তিনি আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেন আমাকে ছোট ছেলের মত হাত ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। নির্জনে নিঃসঙ্গে তপস্যা করবার জন্যে তিনি নৌকো দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। একজন ব্রাহ্ম চিকিৎসক ছাড়া আর কারো তাঁর কাছে যাবার হুকুম রইল না। নৌকায় রাতদিন তিনি বিশ্বজননী কালীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতেন। মন তাঁর উন্মাদনায় বাঁধন-হারা। একদিন সন্ধ্যেবেলা বিপর্যয় ঘটে গেল। যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে যে অবস্থা হয়েছিল এও ঠিক সেই রকম অবস্থা। বিশ্বের যিনি তিমিরের অধিষ্ঠাত্রী, যিনি ধ্বংসের দেবী সেই করালী কালীর ধ্যান করতে করতে হঠাৎ তাঁর অঙ্গে অঙ্গে দেখা দিল কম্পন। জগৎ সংসার এক নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে গেল। ভিতরে গভীর প্রশান্তি, বাইরে দুর্নিবার চাঞ্চল্য। স্বামীজি সেই অবস্থায় "কালী দি মাদার" বলে কবিতাটি লেখেন ঃ

"নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভঃস্থল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।

প্রকাশিছে দিকে দিকে তার—মৃত্যুর কালিমামাখা গায়,
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর, দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালি ! করাল নাম তোর, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণনিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে !
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কালনৃত্য করে উপভোগ—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"*

এই সময়ে ভাববিভোর হয়ে প্রায় তিনি বলতেন, তিনিই ইন্দ্রিয়, তিনিই দুঃখ, তিনিই দুঃখদায়িনী। কালী, কালী, কালী। কিসের ভয় ? ভিক্ষে করে নয়—তাঁর কাচ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে হবে। মার যে সত্যিকার ভক্ত, সে হচ্ছে পাথরের মত শক্ত, সিংহের মত নির্ভীক। বিশ্বসংসার যদি হঠাৎ ধূলোর মত পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে পড়ে তাহলেও তারা ভয় পায় না। মাকে তোর কথা শুনতে বাধ্য কর্। তাঁকে খোসামোদ করা কি ? মনে রাখিস, তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। এমন কি নুড়ি থেকেও মহাবীর্যবান সৃষ্টি করতে পারেন তিনি।

৩০ অক্টোবর বিবেকানন্দ হঠাৎ একাকী ক্ষীরভবানীর দিকে যাত্রা করলেন। বলে গেলেন, কেউ যেন তাঁকে অনুসরণ না করে। ভবানীর মন্দিরে তিনি রোজ হোম

* কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ।

করতেন আর এক মন দুধের তৈরি ক্ষীর, আলোচাল বাদাম প্রভৃতি দিয়ে ভোগ দিতেন। নিষ্ঠাবান ভক্তের মত মালা জপতে জপতে তাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে কেটে যেত। বিধিমত এক ব্রাহ্মণের ছোট মেয়েকে কুমারী পূজা করেছিলেন; এমনিভাবে অসুস্থ শরীরের মায়া না করে কয়েকদিন একাকী কঠোর তপস্যায় কাটিয়ে দিলেন। কর্মযোগী চেয়েছিলেন ভবানীর পাদপদ্মে নিঃশেষে নিজেকে ভস্মীভূত করে দিতে। বিদায়বেলার আগে এই শেষ বারের মত তাঁর অন্তরদেবতা যেন তাঁকে রাঙিয়ে তুলেছিলেন তপস্যার অনলে।

হঠাৎ একদিন স্বামীজি শ্রীনগরে শিষ্যদের নৌকায় ফিরে এলেন। মাথা নেড়া। তাঁকে আর স্বামী বিবেকানন্দ বলে মনে হয় না—কি যেন তাঁর মধ্যে নেই—ভবানীর মন্দিরে কি যেন তিনি চিরদিনের মত হারিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন, আর হরি ওম্ নয়। এবার শুধু মা। আমার সব স্বদেশপ্রেম চলে গেছে—কিছুই আর আমার বলতে নেই। এখন শুধু মা। একদিন মুসলমানদের অত্যাচারে নষ্ট হওয়া মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে ভাবছিলুম, কেমন করে লোকে এ সব অত্যাচার চুপ করে সয়েছিল। আমি সে সময় যদি থাকতুম তো প্রাণ দিয়ে মাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতুম। দৈববাণীতে মা হঠাৎ বললেন, কি! অবিশ্বাসীরা যদি আমার মন্দির ভেঙে মূর্তি

অপবিত্র করে, তোর তাতে কি ? তুই আমায় রক্ষে করছিস না আমি তোকে রক্ষে করছি ?

এর পর থেকে আর সেই পুরানো কর্মযোগী বিবেকানন্দকে দেখতে পাওয়া যায় নি। এর পরে তিনি আরো দেড় বছর বেঁচেছিলেন—নানা কাজেই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছিল। মানুষের প্রেমে পাগল বিবেকানন্দ কাজ ভুলে থাকবেন কি করে ! কিন্তু তাঁর কাজের মধ্যে আর সেই গভীর অনুরাগ ছিল না—তাঁর কণ্ঠে আর সেই সমুদ্রের গর্জন শোনা যেত না। মা ভবানী আগ্নেয়গিরির বুকের আগুন চিরতরে নিবিয়ে দিয়েছিলেন। এখন যা সেই শূন্য বুক থেকে বেরোত—তা শুধু অভ্যাসের ধূম।

১৮ অক্টোবর স্বামীজি বেলুড়ে ফিরে এলেন। তপস্যার কঠোরতায় শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। বাঁ চোখের এক কোণে রক্ত জমে গেছল। মন তাঁর নিয়ত অন্তর্মুখী। ডাকলে সহজে সাড়া পাওয়া যায় না, এমনি অবস্থা। ১২ নভেম্বর নিবেদিতার মেয়েবিদ্যালয় খোলা হল। ক্রমে আস্তে আস্তে তাঁর মনের তন্ময়তা দূর হতে লাগল। মঠে কর্মীদের গড়ে তোলার কাজে কিছু কিছু সাহায্য করতে লাগলেন।



১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর শরীর এত খারাপ হয়ে পড়ল যে গুরুভাই এবং শিষ্যেরা সকলেই ভয় পেয়ে গেলেন। শেষ ২০ জুন তিনি আমেরিকা যাত্রা করলেন। এবার সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং সিষ্টার নিবেদিতা। সেখানে প্রায় এক বছর ছিলেন। কালিফর্নিয়াতেই এবার সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছিল। সেখানকার জল হাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যও একটু ভাল মনে হতে লাগল। কালিফর্নিয়ার রাজধানী সানফ্রানসিসকো, ওকল্যাণ্ড ও আলামোড়ায় বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। কালিফর্নিয়া থেকে চলে আসার আগে শিষ্যা শ্রীমতী মিনি বুক বেদান্ত প্রচারের জন্য স্বামীজিকে এক শ ষাট একর জমি দান করলেন। সাণ্টা ক্লারা অঞ্চলে হ্যামিলটন পর্বতের সানুদেশে সেই বিস্তৃত ভূখণ্ডে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করলেন। এই আশ্রমে থেকে তুরীয়ানন্দ বারজন ছাত্রকে ধ্যানধারণা শেখাতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর এই কর্মস্রোতের মধ্যে পুরাতন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে আর পাওয়া যায় নি। মনে হত, তিনি যেন চলে গেছেন—শুধু অভ্যাসবশে তাঁর বাইরের প্রকৃতি কাজ করে যাচ্ছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল শ্রীমতী ম্যাকলিয়ডকে যে চিঠিখানি* লেখেন তাতে তাঁর মনের ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

* এপিসিলস্, চতুর্থভাগ, পা, ৮৩।

স্নেহাস্পদাসু—

জো, কর্মযোগ সব সময়ে কঠিন। আমার জন্যে প্রার্থনা করো, যেন চিরদিনের জন্যে আমার কাজ করা শেষ হয়ে যায় আর আমার মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় নিঃশেষে মিলে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

লণ্ডনে পুনরায় এসে নিশ্চয়ই তুমি খুশী হয়েছ। পুরাতন বন্ধুদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসা দিও।

আমি ভাল আছি,—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তিই বেশি বোধ করছি। জীবন যুদ্ধে হার জিত দুই-ই হল। এখন পুঁটলি পাঁটলা বেঁধে বসে আছি, পরম মুক্তি-দাতার প্রতীক্ষায়। 'শিব, শিব, পারে নিয়ে চল আমার তরী'।

যতই যা হোক, দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব বাণী শুনতে শুনতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেত যে বালক আমি আজো সেই বালক ছাড়া আর কিছু নই। সেই বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার সত্যিকার প্রকৃতি। কাজকর্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি তা সবই বাইরের জিনিস। আজকাল আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—সেই আগেকার প্রাণ-মাতানো কণ্ঠস্বর। বাঁধন সব টুটে যাচ্ছে, মানুষের মায়া দূর হচ্ছে, কাজকর্ম আর ভাল লাগছে না, জীবনের সব চাকচিক্য শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু গুরুমহারাজের ডাক শুনতে পাচ্ছি। যাই, প্রভু, যাই।

'প্রেতের পিণ্ডদান প্রেতের দল করুক। তুই এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আয়।'—হে প্রেমাস্পদ, আমি আজ তোমার পথেই চলেছি।

হ্যাঁ, এবার ঠিক চলেছি। একেবারে নির্বাণের তীরে এসে

দাঁড়িয়েছি। সময়ে সময়ে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি যেন সেই অনন্ত শান্তির সমুদ্র,—তার বুকে এতটুকু চাঞ্চল্য—এতটুকু ঢেউ নেই।

এই পৃথিবীতে যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী। জীবনে যে কত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করলুম তাতেও খুশী। কাজ করতে করতে বড় বড় ভুল ভ্রান্তি ঘটেছে তাতেও খুশী। আবার এখন যে শান্তির রাজ্যে এগিয়ে চলেছি—তাতেও খুশী। জগতে কারোকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে যাচ্ছি না—কারো বাঁধন নিয়েও যাচ্ছি না। দেহটা ধ্বংস হলে মুক্তি আসুক অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্তি পাই—যাই হোক না কেন, সেই পুরানো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্যে চলে গেছে আর কখনো ফিরবে না।

গুরু, পরিচালক, নেতা, আচার্য, বিবেকানন্দ মারা গেছে—পড়ে আছে শুধু বালকস্বভাব, জীবনের সদাউৎসুক ছাত্র, সেবক বিবেকানন্দ।

তুমি বুঝতে পারছ কেন আর আমি * * বিষয়ে কোন কথা বলতে চাই না। কোন কথা বলবার কি অধিকার আছে আমার? অনেক দিন হল নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছি। হুকুম করার অধিকার আর আমার নেই। * * * * প্রভুর ইচ্ছাস্রোতে যখন সম্পূর্ণরূপে গা ভাসান দিয়ে থাকতুম, সেই দিনগুলি আমার জীবনের সবচেয়ে মধুময় সময় বলে মনে হয়। আবার আমি গা ভাসান দিয়েছি।

আকাশে সূর্যের খর আলো আর সামনে দিগন্তবিছানো শ্যামলিমা। দিনের উত্তাপে চারিদিক চুপচাপ, নিঝুম ধরিত্রী, আর আমি ভেসে চলেছি ধীরে ধীরে নদীর শীতল বুকে—নিজের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা না রেখে। হাত পা নেড়ে সামান্যমাত্র আওয়াজ

করার সাহস পর্যন্ত নেই পাছে এই অপূর্ব নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। প্রাণের এই রকম শান্তিই জগৎটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয়।

আগে আমার কর্ম-আয়োজনের মধ্যে জাগত মানযশের উচ্চাশা, ভালবাসার ভিতর আসত ব্যক্তিবিচার, ব্রহ্মচর্য-সাধনার পিছনে থাকত ভয়, নেতৃত্বের মধ্যে প্রভুত্বস্পৃহা। এখন সে সব মরে যাচ্ছে আর আমি ভেসে চলেছি। যাই, মা, যাই। তোমার স্নেহময় বুকে করে যেখানে আমায় নিয়ে চলেছ সেই অশব্দ, অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, অপূর্ব রাজ্যে কাজ করার সব শক্তি বিসর্জন দিয়ে আমি যাব শুধু দ্রষ্টা হিসাবে।

আহা, কি অসীম শান্তি। মনে হচ্ছে, চিন্তাগুলো পর্যন্ত যেন হৃদয়ের দূর—অতিদূর গভীর তল থেকে অস্পষ্ট দূরাগত গুঞ্জনধ্বনির মত ভেসে আসছে। চারিদিকে শান্তি। মধুর—মধুর সে শান্তি। মানুষ ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে কয়েক মুহূর্ত যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায় তবু মনে হয় যেন ছায়ার মত,—যখন মানুষের মনে থাকে না ভয়, থাকে না কিছুর ওপর টান, থাকে না কোন হৃদয়াবেগ। আমার অবস্থা আজ ঠিক সেই রকম। আমার মনে এখন জেগেছে সেই শান্তি যে শান্তি মানুষ ছবি আর পুতুল দিয়ে সাজানো ঘরে একলা একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করে। যাই, প্রভু, যাই।......”

১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি প্যারিসে ধর্ম-ইতিহাস মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্যে আসেন। সেখান থেকে পুনরায় ইউরোপ ভ্রমণে বেরোন। এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত তাঁর “পরিব্রাজক” বইখানিতে আছে। বেশিদিন আর বিদেশে থাকতে তাঁর ভাল লাগল না। হঠাৎ কোন

খবর না দিয়ে ৯ ডিসেম্বর বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। এখানে এসে শুনলেন সেভিয়ার সাহেব মারা গেছেন। দেরি না করে তিনি ছুটলেন মায়াবতী আশ্রমের উদ্দেশে শোকসন্তপ্ত শ্রীমতী সেভিয়ারএর সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু বেশিদিন হিমালয়ের বুকে থাকতে পারলেন না। হাঁপানিতে ভয়ঙ্কর কষ্ট হতে লাগল।

মায়াবতী আশ্রম অদ্বৈতবাদের কেন্দ্র। হঠাৎ স্বামীজি আবিষ্কার করলেন, মঠের একজন সন্ন্যাসী একখানি ঘরে ঠাকুরের ছবি প্রতিষ্ঠা করে পূজাআরতির ব্যবস্থা করেছেন। এ দৃশ্য তাঁর ভাল লাগে নি। তিনি চেয়েছিলেন, হিমালয়ের এই নিভৃত আশ্রমে মূর্তিপূজার কোন বালাই থাকবে না। বললেন, একি রে, এখানেও সেই বামুন এসে চেপে বসেছেন! কর্মীরা পরে পরমহংসদেবের ছবি সরিয়ে ফেলেছিলেন।

স্বামীজির চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্য আজীবন খুব উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। যে সব বিরাট পুরুষ সাধারণের মধ্যে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের প্রতিভা বিচিত্রমুখী জটিল, তাঁদের চরিত্রে সাধারণত নিরুদ্ধ আবেগের ফলে নানা জট (complexes) পাকিয়ে ওঠে। ভিড়ের মানুষের কল্পনা প্রখর নয়। তাদের চিন্তা চলে সরল পথে এককেন্দ্রিক হয়ে। জটিলচরিত্র নেতাদের পরস্পর বিরোধী গতিবিধি কাজকর্ম সব সময়ে যথাযথভাবে তারা

বুঝতে পারে না। তাই অনেক জননায়ক নিজেদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম সম্বন্ধে ভিড়ের মানুষের সংকীর্ণ সমালোচনা বাঁচিয়ে চলার আশায় খোলাখুলিভাবে মনের আবেগকে সব সময়ে প্রকাশ করতে পারেন না। বিবেকানন্দ-চরিত্র এ ধরণের ছিল না। ছেলে বয়েস থেকেই তিনি একান্ত খোলাখুলিভাবে চলতে ভালবাসতেন। তাই সাগর-ফেরত সন্ন্যাসীর অবিচারে খাওয়াদাওয়া, দামী বেশভূষা, বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে নিঃশঙ্কচিত্তে মেলামেশা করা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কটাক্ষের ভয় থাকলেও তিনি এ সব বিষয়ে ঢাক-ঢাক ভাব ভালবাসতেন না। তেমনি সহকর্মাদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যখন যেখানে মতবিরোধ ঘটত, তা স্পষ্টভাবে বলতে কোনদিন কুণ্ঠিত হতেন না।

আশ্রমের বাইরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঝড় বৃষ্টি। কোথাও যাতায়াতের সুবিধা নেই—কাজকর্ম করার উপায় নেই। এদিকে আবার হাঁপানি বেড়ে উঠল। শেষে তিনি হিমালয় থেকে বেলুড়ে ফিরে এলেন। এখানে এসে তাঁকে বিছানা নিতে হল। আগে থেকেই বহুমূত্র রোগ ছিল—এখন আবার ড্রপসি দেখা দিলে। তাঁর জীবনের এই শেষ বছরের দিনগুলি ভীষ্মের শরশয্যার দিনগুলির মত মরণের প্রতীক্ষায় করুণ। যৌবনের শেষ প্রান্তে তখনো তিনি এসে পৌঁছন নি, অথচ শরীরের উৎসশক্তি নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অদম্য

মন অবসন্ন হয়ে পড়ে নি। রোগের যন্ত্রণা এবং জীবনের কর্মধারার হঠাৎ গতিরোধ দুইই তিনি নির্বিকার মনে সহ্য করেছিলেন, ব্যর্থতার অবসাদ কোনদিন তাঁর সদানন্দ চিত্তে বেদনাসঞ্চার করতে পারে নি। তিনি জানতেন, সব ব্যর্থতা তো ব্যর্থতা নয়। জীবনে অনেক পূজাই সারা হয় না,—আকাশে অনেক তারাই নিঃসীম অন্ধকারে ঘুরে মরে,—মরুর মাঝখানে অবসন্ন অনেক যাত্রীরই যাওয়া নিঃশেষ হয়ে যায়। তবু সেই শেষই শেষ নয়। অনাদি কালের এই মহাস্রোতে ব্যর্থতাও নেই, সাফল্যও নেই। "আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন"। বেলুড়ের সেণ্ট হেলেনায় বন্দী বিবেকানন্দ তাই তো কর্মীদের অভয় দিয়ে বলে গেছেন, ভয় কি, ঠাকুরের ইচ্ছায় কালে এখান থেকে শত শত বিবেকানন্দ জাগবে।

বিবেকানন্দের জীবনের গৌরব সত্য-আবিষ্কারে নয়—সত্য-অনুসরণে। জগতে তিনি নতুন বাণী প্রচার করেন নি—হিন্দুসংস্কৃতির সনাতন বাণীকে নবরূপে ঘোষণা করেছেন। পুঁতির পাতায় যা লুকিয়েছিল তিনি তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিনের আলোকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মানুষের দেবত্ব এবং সকল ধর্মমতের সাম্য ও সমন্বয় তাঁর বই-থেকে জোগাড়-করা জ্ঞান নয়—জীবন দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন মানুষগোষ্ঠীর সেই চরম অনুভূতি। আধুনিক যুগে তাঁর চেয়ে সূক্ষ্ম দার্শনিক—তাঁর চেয়ে কোন

এক শাস্ত্রে কূট পণ্ডিত হয়ত বা আছেন কিন্তু তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয়। তাঁর চেয়ে শক্তিশালী কর্মযোগীর কথা হয়ত জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পাওয়া যাবে কিন্তু এমন বিরাট-প্রাণ কর্মযোগীর সন্ধান দুর্লভ। ভারতবর্ষে তিনি রাজনৈতিক মুক্তির মন্ত্র আবিষ্কার করে দেন নি,—সারাদেশব্যাপী অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও তাঁর কাছ থেকে আমরা পাই নি।—বিস্তৃত সমাজসংস্কারের পথে নতুন সমাজ গড়ার অবসরও তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে মেলেনি। কিন্তু তিনি কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেছেন—ভারতবর্ষের এক কোণ থেকে আর এক কোণের ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন নিজের প্রাণের দীপের স্পর্শে-জ্বালা নবজাগরণের আলোক শিখা। রাজা রামমোহন শুনিয়েছিলেন সমাজ-সংস্কারের বাণী, বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন রাজনৈতিক মুক্তির মন্ত্র, স্বামী দয়ানন্দ জাতিকে ডেকেছিলেন কাজের আয়োজনে—কেউ শুনেছিল, কেউ শোনে নি। ঘুমন্ত জাতের কাছ থেকে তাঁরা সাড়া পেয়েছিলেন সামান্য। বিবেকানন্দ জাগিয়ে তুলেছিলেন বিরাট পাষাণকে। অনেকের ধারণা, রাজনীতির পথ তিনি পছন্দ করতেন না। অবশ্য সত্যি, আমেরিকায় থাকার সময়ে এদেশের কোন কংগ্রেসী পাণ্ডা তাঁর নাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করায় তিনি সোজা অসম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বৃটিশ সরকারের

নির্যাতনের ভয়ে তিনি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি! পৃথিবীতে কোন নির্যাতনের ভয় বিবেকানন্দকে সংকল্পচ্যুত করতে পারত না। কর্মযোগী বিবেকানন্দ তখনকার আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্রব রাখেন নি। তিনি একেবারে গোড়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধিকারসংগ্রামের আদি পুরুষ। সেই হিন্দু সন্ন্যাসীর কণ্ঠেই প্রথম মুসলমান-শিখ-খৃশ্চান-হিন্দু-বাঙালী-বিহারী-গুজরাতী-পাঞ্জাবী ভারতের মহাজাতির ঐক্যের বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ইংরেজি-শিক্ষিত মধবিত্তকর্মী নিয়ে গরীবের মুখে অন্ন আর চিত্তে জ্ঞানদানের কাজ তিনিই প্রথম শুরু করেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের বিচার করতে গিয়ে আমাদের শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে চাইলে চলবে না। তিনি আছেন সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানকে ব্যেপে, আবার তার বাইরেও আছেন তিনি। কোন প্রতিষ্ঠান সেই বিরাটের একমাত্র আধার হতে পারে না। মহাসাগরের জল শুধু মহাসাগরেই নেই। তা আছে মাটির তলায় তলায় সারা পৃথিবীর উর্বরাশক্তির মূলে। তাই তো দেখা যায়, ভারতবর্ষের প্রথম অগ্নিব্রতী রাজনৈতিক কর্মীদল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকেই তাঁদের জীবনের মুক্তিদাতা গুরু বলে স্বীকার করেছেন। ভারতীয় শ্রেষ্ঠচিন্তানায়ক তাঁরই বাণী অনুসরণ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মতত্ত্বের মিলনভূমি

খুঁজছেন। সমাজ সংস্কারক তাঁরই দোহাই দিয়ে মানুষকে ডাকছেন নতুন ধরণের সমাজ গড়ার কাজে। জাতির অর্থনৈতিক মুক্তিকামী কর্মীর চরকার পাশে তাই তো পড়ে থাকে বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী। হরিজন-সেবকের ঝুলির মধ্যে পাওয়া যায় গরীবকে নারায়ণ জ্ঞানে যিনি প্রথম সেবা করতে শিখিয়েছেন তাঁর বক্তৃতাগুচ্ছ। ভারতের মহাশিল্পী তাঁরই অনুপ্রেরণায় ভারতীয় শিল্পধারাকে জাগিয়ে তুলছেন। মহামারী, ভূমিকম্প, প্লাবনে দুর্গত যারা তাদের সাহায্যে আজো লোকে টাকা দেয় স্বামীজিকেই স্মরণ করে।

এ কথা বলা ভুল যে, স্বামীজি ভারতবর্ষকে দিয়েছেন নেতিমূলক, সৃষ্টিলোপকর সন্ন্যাসের মন্ত্র। আধুনিক ফ্রয়েড-ভক্তদের এই ভীতির কোন ভিত্তি নেই। সন্ন্যাস নেতিমূলক আদর্শ নয়। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীকে স্বামীজি শুনিয়েছেন বাঁচার মন্ত্র। সে বাঁচা মানুষের মত বাঁচা—যন্ত্ররাজের দাস হয়েও বাঁচা নয়, যমরাজের পুতুল হয়েও বাঁচা নয়। তাঁর সন্ন্যাস বৈরাগীর কর্মহীন সন্ন্যাস নয়। তিনি চেয়েছিলেন বটে কয়েক হাজার সন্ন্যাসী কর্মী। কিন্তু তা সংসারীদের সেবার জন্যেই। সমস্ত লোককে জোর করে সন্ন্যাস দিয়ে সারা পৃথিবীর প্রাণশক্তির নির্বাণ ঘনিয়ে তোলা তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

নেভার আগে জ্বলে ওঠে তেল-ফুরানো দীপের শেষ

শিখা। হঠাৎ কয়েকদিন স্বামীজিকে খুব সুস্থ বোধ হতে লাগল। সকলেই মনে করলেন বুঝি এবার একটু ভাল হয়ে উঠবেন। সেদিন ৪ জুলাই, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ। দুপুরে খাবার পর একটু বিশ্রাম করে ব্রহ্মচারীদের ডেকে তিনি সংস্কৃত ক্লাস নিলেন। বিকেলে সাথী প্রেমানন্দের সঙ্গে বেলুড়ের বাজার পর্যন্ত হেঁটে এলেন। এতদূর অনেকদিন হাঁটেন নি। মঠে ফিরে সকলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে বসে গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যান করতে লাগলেন। কাছে একজন ব্রহ্মচারী অনুচর বসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক ধ্যানের পর তিনি সেই ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন, বড় গরম, জানলাগুলো খুলে দে। আর একটু হাওয়া করতো। তখনো হাতে তাঁর জপের মালা। বিছানায় শুয়ে তিনি জপ করতে লাগলেন আর ব্রহ্মচারী আস্তে আস্তে তাঁর পা টিপে দিতে লাগলেন। ক্রমে মনে হল যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত ন টার সময় হঠাৎ মুখে অস্ফুট শব্দ করতে করতে তিনি পাশ ফিরে শুলেন। হাতখানি কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। আর মাথাটি আস্তে আস্তে বালিশ থেকে পাশে গড়িয়ে এল। তারপর সারা অঙ্গ হয়ে গেল স্থির—নিশ্চল। ক্লান্ত শিশু যেন ক্ষণিকের জন্যে ছটফট করে মার কোলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সূর্যের একদিকে থাকে উদয় আর একদিকে অস্ত—একদিকে আলো, আর একদিকে অন্ধকার,—জ্যোতিঃ তার অবিনশ্বর। সেই বিরাট শক্তির প্রকাশ আজ কোন্ গ্রহে নররূপে নবতর যুগের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে ?

শেষ

শুদ্ধি-তালিকা

পাতা	অশুদ্ধ পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১০	পরিস্কার	পরিষ্কার
১৩	কোলকাতায়	কলকাতায়
১৪	আশঙ্কা	আকাঙ্ক্ষা
১৮	অদ্ভুত	অদ্ভুত
২৭	স্পর্শে	স্পর্শে
৩০	উজ্জল	উজ্জ্বল
৭৩	হাসিখুশি	হাসিখুশী
৭৬	ভীড়	ভিড
৯২	জ্বালাবেন	জ্বালাবেন
১৭৩	নররূপে	নবরূপে

লেখকের লেখা আরো বই :

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

সুশ্রী বাঁধাই, দাম দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান, বিশ্বভারতী
২১০ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা।

বাংলা সাহিত্যে এ রকম জীবনী এই প্রথম। লেখক বিশ্বভারতার বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পাদনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী হিসাবে কবির খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তিনি পেয়েছেন কবির সম্বন্ধে অপরূপ অন্তর্দৃষ্টি।

১। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"It shows considerable powers of observation and of forming an idea of a man's personality from what he says and does. For this kind of work what is necessary, among other things is capacity for psychological study. This the author possesses. The book is written in an attractive styte."

২। "কানন বাবুর এই চরিত্র চিত্রন বিশেষ আদরনীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি ছাড়া কোন গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। কানন বাবুই এ কাজে বোধ হয় সর্বপ্রথম হাত দিয়াছেন।"
(আনন্দবাজার পত্রিকা)

৩। "বইখানি পড়িলেই বুঝা যায়, তিনি কি গভীর দৃষ্টি এবং আন্তরিকতা দিয়া কবির অন্তর্লোকের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে ও করাইতে পারিয়াছেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যে জীবনীসাহিত্য বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। এই বইখানির মধ্যে দৃষ্টির নূতনত্ব আছে, বিশ্লেষণ এবং বিচারপদ্ধতিও প্রশংসার্হ। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের বিচিত্র, বহুমুখী আকর্ষণ বিকর্ষণকে বুঝিবার চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা সম্বন্ধে একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হইবার ফলে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে।" (প্রবর্তক)